দাম : দশ টাকা

ভারত ও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে রোহিঙ্গা ইস্যু সৃষ্টি করেছে পাক-সৌদি চক্র —পৃঃ ১৪

স্বস্তিকা

তাজমহলের উপেক্ষিত ইতিহাস — পৃঃ ২১

৭০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ১৩ নভেম্বর ২০১৭।। ২৬ কার্তিক - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

তাজমহল আসলে কী?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ২৬ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৩ নভেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

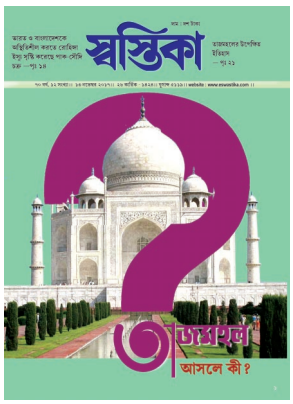

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : ঘেউ ঘেউ করবেন না, ছুটিতে যান... □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

দীর্ঘমেয়াদি আমানতের সুদ-নির্ভর প্রবীণরা মরতে বসেছেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১১

ভারত ও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে রোহিঙ্গা ইস্যু সৃষ্টি করেছে পাক-সৌদি চক্র □ মানস ঘোষ □ ১২

মগের মুলুক থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা □ সুজয় চট্টোপাধ্যায় □ ১৬

পশ্চিমবঙ্গে শুধু ডেঙ্গি নয়, দাঙ্গাও মহামারীর আকার ধারণ করেছে □ একলব্য রায় □ ১৮

তাজমহল আসলে শিবমন্দির □ ড. প্রসিত রায়চৌধুরী □ ১৯

তাজমহলের উপেক্ষিত ইতিহাস □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২১

ভারতবর্ষে এই প্রথম অপুষ্টি রোধে মোদী সরকার মোকাবিলায় নেমেছে □ অমিতাভ কান্ত □ ২৭

হিন্দু বাঙালির উপাধি □ রবীন সেনগুপ্ত □ ৩১

সংস্কৃত শিক্ষাদানে মধুসূদন চতুষ্পাঠী □ ড. বৃন্দাবন ঘোষ □ ৩২

গণমাধ্যমের লাগামহীন স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে □ কে এন মণ্ডল □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭** □ **অন্যরকম : ৩৮** □ **স্বজন-বিয়োগ : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ডেঙ্গু-মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি

ডেঙ্গু রোগটা যতটা ভয়াবহ তার থেকেও ভয়াবহ সম্ভবত এই রোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল দলের রাজনীতি। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা ডেঙ্গুতে মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান দেন, মমতা তা পাল্টে দেন। বেসরকারি ল্যাবের দেওয়া তথ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা নেই। কারণ, ওরা সরকারের বদনাম করতে চায়। সাধারণ মানুষকে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে রাখাই কি এই রাজনীতির উদ্দেশ্য? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন ডা: ইন্দ্রনীল খাঁ। সঙ্গে থাকবে ডেঙ্গুর চিকিৎসা নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু লইয়া সরকারের দমন-নীতি

ডেঙ্গু লইয়া সাম্প্রতিক একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রায় অবলুপ্ত শব্দ শোনা যাইল। শব্দটি হইল মহামারী। আঠারো কিংবা উনিশ শতকে তো বটেই, বিংশ শতাব্দীতেও মহামারী শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। অজানা রোগে মানুষ মারা যাইতেন, গ্রাম জুড়িয়া মড়ক লাগিত, সে ছিল বিনা-চিকিৎসার যুগ। একবিংশ শতাব্দীর ন্যায় চিকিৎসা পদ্ধতির অভূতপূর্ব উন্নতি তখন হয় নাই। মহামারী শব্দটির বহুল প্রচলন সেইসময় ছিল। বর্তমান যুগে দাঁড়াইয়া কর্কট রোগকে মারণ রোগ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। তবে ইহার সহিত যুঝিবার জন্যেও চিকিৎসা বিজ্ঞান আধুনিক কালে সমর্থ হইয়াছে।

এই উন্নততর চিকিৎসাশাস্ত্রের কালে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটি বেশ ভিন্ন। কর্কট ব্যতীত ডেঙ্গুও যে মারণরোগ হইতে পারে, তাহা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ হইত না। চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এই একবিংশ শতাব্দীতে কোনো রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিতে পারে ইহা পশ্চিমবঙ্গে না জন্মাইলে বোঝা যাইত না। উন্নয়নশীল দেশে দাঁড়াইয়া মানুষ অসহায়ভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গে না আসিলে তাহা উপলব্ধির সুযোগ হইবে না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিবে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? যাহাই ঘটুক, তাহার নৈতিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সেই দিক দিয়া রাজ্য-প্রশাসনের নৈতিক দায় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ব্যবহারিক দায়? ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ। সুতরাং এই রোগের জন্য যদি কাহাকে দায়ী করা যায়, সেটি অবশ্য এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দশা হইয়াছে 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাই নাই'-এর ন্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কোপে পড়িয়া চিকিৎসকদিগকে এবারের দুর্গাপূজার অসুর সাজিতে হইয়াছে। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গু লিখিলে আর কী সাজিতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা খোদ রোগটিকেই অস্বীকার করিয়াছেন। যেখানে রোগ নির্ণয়েই এত প্রবঞ্চনা, শঠতা সেখানে রোগ ভাল করিবার আন্তরিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠিবেই।

মশা দমন করিতে সরকার কিংবা পুরসভার ব্যর্থতা লইয়া বাজার সরগরম হইবেই, জন-সচেতনতার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবে উঠিবে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এসব ছাপাইয়া মূল রোগটিকে সরকারের চাপিয়া যাওয়ার কৌশলের কথাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌশল ফলপ্রসূ করিতে ডাক্তারদের হুমকি প্রদান হইতে হাসপাতাল, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের উপর প্রকৃত রোগটির নাম প্রকাশ না করিতে চাপ সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার লইয়াছে, তাহা কেবল অ-রোগীর হাসির খোরাকই হইতেছে না, রোগী ও তাঁহার আত্মীয়দের আতঙ্কের কারণও হইতেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাধিগ্রস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতিকে জরাগ্রস্ত করিয়া দিবার কৃতিত্ব এ রাজ্যের বর্তমান সরকার-প্রশাসনের কম নহে।

মুখ্যমন্ত্রীর সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। তিনি কেবল আত্ম-নাম জাহির করিতেই পারদর্শী, মানুষের বাঁচা-মরা তাঁহার কাছে গুরুত্বহীন। এই কারণে রাজ্য যখন বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ হইতেছে যে জ্বর হইলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসুন বিনামূল্যে পরীক্ষা করাইতে, তখন বাস্তব পরিস্থিতি কতটা ভিন্নমুখী তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও পশ্চিমবঙ্গে মহামারী দেখা যায়, রোগ লইয়া শাসকের দমন নীতি দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে প্লেগ লইয়া বিদেশি শাসক যে অসভ্যতা করিত, মমতা-সরকারের সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সরকার ডেঙ্গু দমন নহে, রাজ্যবাসীকেই অবদমিত করিতে প্রস্তুত।

সুভাষিতম্

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চ অশুদ্ধমেব চ।

অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্।। (উপনিষদ্)

মন হলো দু'রকমের—শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। কামসংকল্পযুক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামবর্জিত মন শুদ্ধ।

বিমুদ্রীকরণ : ২.২৪ লক্ষ নিষ্ক্রিয় কোম্পানি চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিমুদ্রীকরণ ঘোষিত হবার পর গত এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট বাণিজ্য মন্ত্রক ২.২৪ লক্ষ কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দু'বছরের বেশি সময় ধরে কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রচলিত আইন মেনেই এইসব কোম্পানির আর্থিক লেনদেনে কেন্দ্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ৫৬টি ব্যাঙ্কের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ৩৫০০০ ভুয়ো সংস্থার ৫৮০০০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৭০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বিমুদ্রীকরণের পর। একটি ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত সংস্থাটির ৮ নভেম্বর ২০১৬ (বিমুদ্রীকরণ ঘোষণার দিন) তারিখে ব্যাঙ্কে কোনও ব্যালান্স ছিল না, অথচ বিমুদ্রীকরণ, পরবর্তী সময়ে ২৪৮৪ কোটি টাকার লেনদেন করেছে সংস্থাটি।

এইসব সংস্থার ব্যাঙ্কিং লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পাশাপাশি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্স (সিবিডিটি), ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (এফ আই ইউ), ডিপার্টমেন্ট অব ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (ডিএফএস) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তদন্ত থেকে এমন এক সংস্থার খবর পাওয়া গেছে যাদের ব্যাঙ্কে ২১৩৪টি অ্যাকাউন্ট ছিল। এইসব ভুয়ো সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অফিসের উদ্যোগে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। যার নেতৃত্বে থাকবেন কর্পোরেট বাণিজ্য মন্ত্রকের রাজস্ব সচিব এবং সচিব। সেই সঙ্গে, যেসব সংস্থার ডিরেক্টররা পরপর তিন বছর (২০১৩-১৪, ১৪-১৫, ১৫-১৬) রিটার্ন/অর্থনৈতিক ঘোষণাপত্র দাখিল করেননি তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্র। এর ফলে ৩.০৯ লক্ষ ডিরেক্টর ব্যক্তিগত ভাবে বিপদে পড়বেন।

হিমাচল প্রদেশ : দেবভূমিকে মাফিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করার ডাক মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিমাচলে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবার পর প্রতিটি রাজনৈতিক দল ময়দানে নেমে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংহ হাইকম্যান্ডের উদাসীনতা সত্ত্বেও রাজ্যের উন্নয়নকে পুঁজি করে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনটি বিশাল জনসভায় বিজেপি হিমাচলে ক্ষমতায় এলে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, হিমাচলকে অবিলম্বে পাঁচ মাফিয়ার হাত থেকে মুক্ত করা দরকার। পাঁচ মাফিয়া হলো— খনি মাফিয়া, জঙ্গল মাফিয়া, ড্রাগ মাফিয়া, টেন্ডার মাফিয়া এবং ট্রান্সফার মাফিয়া। হিমাচল প্রদেশের কুলুতে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'কংগ্রেস এবং দুর্নীতি সমার্থক। কংগ্রেসের বেশিরভাগ নেতা বেল পাওয়ার ফলে জেলের বাইরে রয়েছেন অথচ ওরাই দিনরাত দুর্নীতির কথা বলে গলা ফাটান।'

এরপরেই তিনি পাঁচ মাফিয়ার হাত থেকে হিমাচলকে মুক্ত করার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, গত ৭০ বছরে কংগ্রেস দুর্নীতি, মিথ্যাচার জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি এবং স্বজনপোষণ ছাড়া আর কিছুই করেনি। এই মুহূর্তে সারা বিশ্ব এক নতুন ভারতকে দেখছে যার কৃতিত্ব তিনি দেশের ১২৫ কোটি মানুষকে দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের কাছে দেশের আগে দল। দলের স্বার্থ ছাড়া কংগ্রেসিরা অন্য কিছু ভাবতে পারেন না।' হিমাচলের উন্নয়ন কীভাবে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী পরিকাঠামোর উন্নতির ওপর জোর দেন। বলেন, 'হিমাচলের এখন উন্নয়নের দুটো ইঞ্জিন দরকার। কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার এবং রাজ্যেও বিজেপি সরকার।'

সব শেষে প্রধানমন্ত্রী তিন-চতুর্থাংশ গরিষ্ঠতা-সহ বিজেপিকে জেতাবার জন্য হিমাচলবাসীকে অনুরোধ করেন।

সন্ত্রাসবাদের সম্ভাব্য উৎস

সৌদি আরবে হাদিশ সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সৌদি আরবকে বলা হয় ইসলামের জন্মভূমি। খোদ সেই দেশেই পয়গম্বর হজরত মহম্মদের বাণী এবং উপদেশের সংকলক গ্রন্থ হাদিশের কার্যকারিতা এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পয়গম্বরের যেসব উপদেশ সন্ত্রাসবাদের ইন্ধনের কারণ হতে পারে অথবা যেসব উপদেশের অপব্যাখ্যা করা সহজেই সম্ভব— সেগুলি খুঁজে বের করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।

রয়টার সূত্রে জানা গেছে, হাদিশে বর্ণিত পয়গম্বরের প্রতিটি বাণী এবং উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন সৌদি আরবের সুলতান সলমন। এমনকী যেসব বিধি-নিষেধ ইসলামি জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাও র‍্যাডারের নীচে ফেলে পরীক্ষা করা হবে বলে খবর। সৌদি আরবের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের খবরে জানা গেছে,

পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হাদিশের প্রতিটি সংস্করণ থেকে ভুয়ো আয়াতগুলি খুঁজে বের করে বাতিল করবেন। সেই সঙ্গে ইসলামের শিক্ষার বিরোধী যেসব আয়াত প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে বা প্ররোচনা দেয় সেগুলিও বাতিল হবে। কমিটিতে থাকবেন সারা বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামি পণ্ডিতেরা। কমিটির হেড কোয়ার্টার হবে মদিনায়। কিন্তু কমিটির কাজের পদ্ধতি কীরকম হবে সে বিষয়ে মন্ত্রকের মুখপাত্র কোনও মন্তব্য করতে চাননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সন্ত্রাসবাদের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য ইসলামিক স্টেট বা আলকায়দার মতো জঙ্গি সংগঠন ব্যাপকভাবে হাদিশের সাহায্য নেয়। এমনও বলা হয় হাদিশই নাকি তাদের বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠুরতার উৎস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

ভারতের দিক থেকে বিচার করলে এই উদ্যোগ আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মাটিতে ঘটে চলা সন্ত্রাসের পিছনে রয়েছে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের হাত। সেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সৌদি আরবের আলসাদ রাজবংশের সঙ্গে ওয়াহাবিদের সুখের সম্পর্ক। বস্তুত, দুনিয়াজুড়ে তেল বিক্রির টাকায় ওয়াহাবিদের মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্সিজেন জুগিয়ে এসেছে এই রাজবংশই। সুতরাং সুলতানের এই উদ্যোগ ওয়াহাবিদের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই এখন দেখার।

৯/১১ মুম্বই হামলার দায় ঘুরিয়ে স্বীকার পাক-কূটনীতিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০০৮-এর মুম্বই হামলা পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আন্তর্জাতিক ভাবে এবং কাশ্মীর ক্ষেত্রে 'স্থায়ী ক্ষতে'র সৃষ্টি করেছে বলে স্বীকার করে নিলেন প্রাক্তন পাক বিদেশ-সচিব রিয়াজ মহম্মদ খান। ওয়াশিংটনে পাক-দূতাবাসে আয়োজিত 'কাশ্মীর দিবস'-এর অনুষ্ঠানে তিনি এই কথাগুলি বলেন। এর ফলে মুম্বই হামলায় পাক যোগের প্রমাণ যেমন পুনরায় প্রমাণিত হলো, তেমনি কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টিতে পাকিস্তানের মদতেরও প্রমাণ মিলল।

সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি নিকি হ্যালি সন্ত্রাসের প্রশ্নে পাকিস্তানের ভূমিকা সদর্থক কিনা সেই প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যেই সরব হন।

কূটনীতিজ্ঞরা মনে করে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সন্ত্রাস প্রশ্নে পাকিস্তান তো বটেই, চীনও কোণঠাসা। বিগত জমানায় সরকারের নরম মনোভাবের ফলে কূটনীতির মঞ্চে ভারত পাকিস্তানকে চেপে ধরতে পারেনি। মোদী জমানায় যেটা একশ শতাংশ করা গিয়েছে। প্রাক্তন পাক-কূটনীতিক তৌকির হুসেন যিনি বর্তমানে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কূটনীতির অধ্যাপক তিনি ওই অনুষ্ঠানে কাশ্মীরিদের 'সংগ্রামে'র ব্যাপারে যে সহানুভূতি ভিক্ষে করেছেন, তা ভারতের কাছে কূটনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়েই; এমনটাই মনে করেন কূটনৈতিক মহল।

২০০৮-এর মুম্বই হামলায় ১৬৬ জন ভারতীয় নাগরিক মারা গিয়েছিলেন। হামলাকারী জঙ্গি আজমল কাসভ ফাঁসির আগে পর্যন্ত ভারতীয় জেলেই বন্দি ছিল। তাকে জেরা করেই হামলার পেছন পাক সেনাবাহিনী, আই এস আই ও জঙ্গিদের যোগসাজশ স্পষ্ট হয়। কিন্তু পাকিস্তান বরাবরই এই তত্ত্ব অস্বীকারের চেষ্টা করেছে। যদিও রিয়াজ খানের মতো শীর্ষস্থানীয় পাক-কূটনীতিকের এধরনের মন্তব্যই এর পেছনে পাকিস্তানের হাত স্পষ্ট করেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

বিমুদ্রীকরণের বর্ষপূর্তি : কালোটাকা ধরার অভিযান আরও জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি আয়কর দপ্তরের একটি দল বিমুদ্রীকরণ সময়কালের বিভিন্ন জমা-খরচের পরিসংখ্যান নিয়ে গাজিয়াবাদে তাদের অন্যতম একটি দপ্তরে কয়েক মাস ব্যস্ত রয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য সংগৃহীত কয়েক লক্ষ পরিসংখ্যানগুচ্ছকে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা করে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক-গ্রাহক উল্লেখিত সময়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সুযোগের অসদ্ব্যবহার করেছে তাদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

এই সূত্রে চলতি সপ্তাহে যখন নোট বাতিল সিদ্ধান্তের এক বছর পূর্ণ হবে ঠিক তখনই আয়কর দপ্তর ৭০ হাজার এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে নোটিশ দিতে যাচ্ছে যারা ওই সময় ৫০ লক্ষের বেশি বাতিল নগদ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অ্যাকাউন্টে এই মর্মে বিভিন্ন ডাটা আপলোড হওয়া সত্ত্বেও আয়কর দপ্তরে কোনো ব্যাখ্যা

পাঠায়নি। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বাৎসরিক রিটার্নও দাখিল করেনি যেখানে তাদের মতোই অন্য ১ লক্ষ ৩ হাজার লোক যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়ে রিটার্ন জমা করেছে। আয়কর দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী আয়কর দাতাদের নোটিশ পাঠাবার আগে রিটার্ন ফাইলের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল। রিটার্ন ফাইলের বর্ধিত শেষ দিন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। যে ১৮ লক্ষ লেনদেনকে দপ্তর সন্দেহজনককে তালিকায় রেখেছিল তার মধ্যে ১২ লক্ষ করদাতা বা ব্যাঙ্কগ্রাহক ইতিমধ্যেই আয়কর দপ্তরে যোগাযোগ করে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দপ্তর এখন এই ৬ লক্ষ অ্যাকাউন্টসের ওপর নজর রাখছে।

দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্তার কথায় তাঁরা এবার রাঘববোয়াল ধরতে জাল ফেলবেন। চুনোপুঁটি আইনভঙ্গকারীদের কথা পরে বিবেচনা করা হবে। তাদের আরও একটি সুযোগ দেওয়ার কথাও বিবেচনায় আছে। দপ্তরের লক্ষ্য আগামী দু' বছরের মধ্যে এই সমস্ত অ্যাসেস্‌মেন্ট শেষ করে ফেলা। সেই কারণে বড় মাথাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এই সপ্তাহ থেকেই শুরু হচ্ছে।

সূত্র অনুযায়ী যে নতুন ২২ হাজার রিটার্ন ৮ নভেম্বরের পর ফাইল করা হয়েছে ও বহুক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে তাতে আবার সংশোধন করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেনিয়ম হওয়া ছাড়াও প্রদত্ত হিসেব-নিকেশের সঙ্গে ব্যাঙ্কের খাতার গরমিল থেকে যাচ্ছে।

বাতিল হওয়া টাকার ৯৯ শতাংশ ব্যাঙ্কে ফিরে আসায় সরকারের সিদ্ধান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাহলে কি এটি ব্যর্থ হয়েছে? কোনো কালোটাকাই অর্থনীতিতে ছিল না? অথচ এর পরিণতিতে অর্থনীতির গতি বিরোধীদের মতে ভয়ঙ্কর ভাবে থমকে গেছে।

এই সূত্রেই সরকার রাজস্ব দপ্তরের ওপর বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে অর্থনীতিতে গুপ্ত থাকা কালোটাকা খুঁজে বের করার। সে কারণে সম্প্রতি শেয়ার কেনাবেচার মাধ্যমে বেআইনি টাকা অন্য পথে গিয়ে থাকলে আয়কর দাতা যে অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসেব দিয়েছেন, নগদ লেনদেন ছাড়াও এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখে একটা যোগসূত্র বার করতে দপ্তর কাজ করছে। দেখে মনে হয় নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ নেই। কালোটাকা ধরার অভিযান হয়তো সবে শুরু হলো।

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ মাসুদ আজহারের ভাইপো খতম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ানা জেলায় আগলার কান্দি অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত তিনজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে। জইশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠীর প্রধান মাসুদ আজহারের ভাইপো তেলহা রসিদ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে অন্যতম বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, আগলার কান্দি অঞ্চলে তেলহা রসিদ-সহ জইশের অন্য দুই কম্যান্ডার মহম্মদ ভাই এবং ওয়াসিম নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। সন্ত্রাসবাদীদের কাছে একটি এম সিক্সটিন এবং দুটি এ কে-৪৭ রাইফেল পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য শ্যামসুন্দর। কিছুদিন আগে তেলহা রসিদ, মহম্মদ ভাই এবং ওয়াসিম একটি পুলিশ চৌকি আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণে আবদুল সালাম নামে এক কনস্টেবল মারা যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত দশ মাস ধরে নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সময়ে ১৮০ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে জইশ-প্রধান আবু খালিদ, আবু মুসাইব আবু দুজানা, সবজর আহমেদ ভাট আবু ইসমাইল প্রমুখ। কাশ্মীরে এখন ২২০ জন জঙ্গি সক্রিয় রয়েছে।

সোনিয়ার গোপন চিঠি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০০৪ সালে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক আট মাস পর সোনিয়া গান্ধী তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমকে দুটি চিঠি লিখেছিলেন। তেহলকা ডট কমে অর্থ লগ্নিকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যে তদন্ত সেই সময় চলছিল তা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে লেখা হয়েছিল চিঠি দুটি। সোনিয়ার বিশেষ পক্ষপাত ছিল অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা ফার্স্ট গ্লোবালের প্রতি। সম্প্রতি ইংরেজি সংবাদ চ্যানেল রিপাবলিক টিভির হস্তগত হয়েছে চিঠিদুটি। এছাড়া, কংগ্রেস নেত্রী জয়া জেটলির প্রকাশিতব্য গ্রন্থেও জায়গা করে নিয়েছে। তেহেলকার স্টিং অপারেশন কংগ্রেসের প্ররোচনাতেই হয়েছিল কিনা জানতে চাওয়া হলে জয়া বলেন, স্টিং অপারেশনের খবর পাওয়া মাত্র প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ছুটতে ছুটতে সংসদে এসে বলেছিলেন, সরকার গয়ি! তাছাড়া, কংগ্রেস যদি এর পিছনে না থাকে তাহলে কপিল সিব্বল থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধী— সবাই তেহেলকাকে এত সাহায্য করলেন কেন?'

উবাচ

"এই রাজ্যে এটাই শেষ টিপু জয়ন্তী হতে চলেছে।"

কর্ণাটকে টিপু জয়ন্তী প্রসঙ্গে

প্রতাপ সিংহ
বিজেপি লোকসভা সদস্য, কর্ণাটক

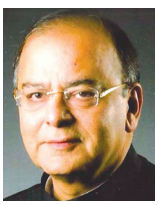

"এটা একটা দারুণ ব্যাপার। কারণ এই ঘটনার পর সবাই বুঝতে পারবে কোনও কিছুই আর গোপন রাখা যাবে না।"

পানামা পেপার প্রকাশ উপলক্ষে

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

"জাতীয় ক্ষেত্রে আমার ক্যাপ্টেন অমিত শাহ আর বাংলায় আমার ক্যাপ্টেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলায় কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।"

বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে

মুকুল রায়
সদ্য বিজেপিতে আগত প্রাক্তন সাংসদ

"সংবাদমাধ্যম যদি মানুষের কথা তুলে ধরে, তাহলে আমি খুশি হবো।"

চেন্নাইয়ে একটি তামিল সংবাদপত্রের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের উদ্দেশে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"ভারতীয় ফিল্ম নির্মাতাদের কয়েকজন ইচ্ছে করেই হিন্দুধর্মকে অবমাননার চেষ্টা করেন। অন্য ধর্মকে অবমাননার সাহস তাঁদের নেই।"

'পদ্মাবতী' বিতর্ক প্রসঙ্গে নয়া দিল্লিতে

গিরিরাজ সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ঘেউ ঘেউ করবেন না, ছুটিতে যান....

মাননীয় সরকারি কর্মচারীগণ,

আপনাদের লজ্জা করা উচিত। ছুটি দিলেই আপনারা দু'হাত তুলে নাচতে থাকেন। ছুটির প্রতিবাদ করুন। এই যে আপনারা ছুটি পেলেই খুশি হন সেই কারণেই আপনাদের ডিএ বাড়ে না। বেতন বাড়ে না। সম্মান বাড়ে না।

নাকের বদলে নরুন, দুধের বদলে পিটুলিগোলা— একের বদলে আর একের রকমারি উদাহরণ লোকশ্রুতিতে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই তালিকায় নতুন একটা নিদর্শন যোগ করেছেন। বেতনের বদলে ছুটি। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর দাবি উঠলে মুখ্যমন্ত্রী পূজার সময় অতিরিক্ত 'ছুটি' প্রদান করেছিলেন।

ছট পুজোয় ছুটি দিয়েছেন। আগামী দোলের সময়ে চারদিনের টানা ছুটির ব্যবস্থা করেছেন। তবে সব থেকে অন্যায়টা হয়েছে পার্শ্বশিক্ষকদের প্রতি। তাঁদের নামের সঙ্গে শিক্ষক শব্দটি থাকলেও শিক্ষকের উপযুক্ত মর্যাদা তাঁরা কোনও দিক থেকেই পান না। তাঁদের বেতনও নিতান্ত সামান্য। তাঁরা বেতনবৃদ্ধির দাবি তুলেছিলেন। সেই দাবিতে কর্ণপাত না করে রাজ্য সরকার তাঁদের 'ক্যাজুয়াল লিভ' আরও দুই দিন বাড়িয়ে দিয়েছেন। পার্শ্বশিক্ষকরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। শাসকদলাশ্রয়ী পার্শ্বশিক্ষকদের সংগঠনও অর্থের পরিবর্তে ছুটির এই সিদ্ধান্তকে অপমান বলেই মনে করেছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মনে আছে কি, হীরক রাজার আদেশে যখন শিক্ষামন্ত্রী দলবল নিয়ে এসে পাঠশালা বন্ধ করে ছুটি ঘোষণা করেন, তখন শিক্ষকের

অপমান হয়েছিল। অনেকে বলতেই পারেন হীরক রাজের সঙ্গে এই বেতনের বদলে ছুটি দানের তুলনাই চলে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো আর স্কুল বন্ধ করে দেননি হীরক রাজ্যের মতো। তবে, ৩৬৫ দিন ছুটি দিলেই তো হয়। তবে আর বেতনই দিতে হবে না।

বেতন ও ছুটি যদি বদলা বদলি করে চলতে পারে তবে যে ভাবে রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী হচ্ছে তাতে একদিন সেটাই হয়তো হবে। রোজ ছুটি। নো বেতন। নো ডিএ।

হে ছুটি প্রিয় বাঙালি সরকারি কর্মীগণ, আর কত ঘুমোবেন! এবার রোজ ছুটি হলে খাবেন কী! অনেকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনওকালেই কর্মতৎপর নয়। বাঙালি আলসে জাত। এটা পুরোটা ঠিক না হলেও পুরোটা মিথ্যাও নয়। মুখ্যমন্ত্রী সেটা বিলক্ষণ জানেন বলেই ছুটি তাসখানি খেলেন। আফিমখোরকে আফিম দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতো ছুটিখোরকে ছুটি দিয়ে দীঘা পাঠিয়ে দেওয়া।

সরল মনে যাঁরা গা এলিয়ে বিছানায় শুয়ে ছুটি কাটান তাঁরা মনে রাখবেন সরলতা ভাল কিন্তু অতি সরলতা বিপজ্জনক। এই হীরক রানির দেশে খুব বেশি দেরি নেই সেই দিনের যখন সরকার জানিয়ে দেবে— কম খেলে নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ।

—**সুন্দর মৌলিক**

দীর্ঘমেয়াদি আমানতের সুদ-নির্ভর প্রবীণরা মরতে বসেছেন

গূঢ় পুরুষের

কলম

আজ ভারতীয় সমাজের প্রবীণ মানুষজনের কষ্টের কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সর্বশেষ জনগণনার রিপোর্টে বলা হয়েছিল ভারতে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা প্রায় এগারো কোটি। তারপর কেটে গেছে ছয় বছর। প্রতি বছর প্রবীণ মানুষের সংখ্যা এক কোটি বৃদ্ধি হলে বর্তমানে সারা দেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এদের মধ্যে বারো কোটি প্রবীণ মানুষ বেসরকারি ক্ষেত্রে একদা কর্মরত ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করতেন বলে কোনো পেনশন পান না। অবসরের সময় তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ যে সামান্য টাকা পেয়েছিলেন তা ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে জমা করে বাৎসরিক সুদের টাকায় বেঁচে আছেন। প্রতি বছর ব্যাঙ্কগুলি তাদের মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্পের বাৎসরিক সুদের হার কমাচ্ছে। সুদের হার কমতে কমতে প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্পে বাৎসরিক সুদ দাঁড়িয়েছে ৮.০৩ শতাংশে। বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী পি এফ এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ যদি ১০ লক্ষ টাকা হাতে পেয়ে থাকেন তবে সুদ বাবদ তাঁর মাসিক আয় এখন আট হাজারের সামান্য বেশি। এটাও সত্যি যে বেসরকারি ক্ষেত্রে অবসরের সময় খুব কম ব্যক্তিই হাতে ১০ লক্ষ টাকা পান। বেশিরভাগ কর্মী তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা হাতে পান। এঁরা মাসে ২ হাজার থেকে চার হাজার টাকা সুদ বাবদ হাতে পান। শুধু তাই নয় অধিকাংশ বেসরকারি অফিসে কর্মীদের অবসরের বয়স এখন ৫৮ বছর বা তারও কম। সরকারি ক্ষেত্রে অবসরের বয়স ৬০ বছর। তবে রাজ্য সরকার চিকিৎসক এবং কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অবসরের বয়স ৬৫ বছর করে দিয়েছে। তাছাড়া অবসরের সময় সরকারি কর্মীরা সকলেই পি এফ এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রাপ্য টাকা পান। সেটা বাদে তাঁরা সরকারি পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি কর্মীরা পুরোপুরি সুদ নির্ভর। সরকারি কর্মীরা সংগঠিত। তাঁদের ইউনিয়ন আছে। মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। ভাতা বৃদ্ধি হলে পেনশন বৃদ্ধি হয়। বেতন সংশোধন কমিশনের সুপারিশে কর্মরত সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হলে সেই সুবিধা পেনশনভোগীরাও পান। কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণদের ভাগ্যে এঁটোকাঁটাও জোটে না।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবীণদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। প্রবীণদের স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সরকারি কর্মীরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্যবিমার আওতায় থাকেন। বিমার প্রিমিয়াম রাজ্য সরকার দেয়। এদিকে সুদের উপর নির্ভরশীল প্রবীণ নাগরিকদের আয় যেমন কমছে, তেমনি বাজার দর বাড়ছে। তাঁদের এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ১৯৯৯ সালে মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্পে ব্যাঙ্কে সুদের হার ছিল ১৪ শতাংশ। এখন ৮ শতাংশের সামান্য বেশি। সরকারি কর্মীদের রক্ষাকবচ (পেনশন) আছে। বেসরকারি কর্মীদের অবসরের পর তাঁদের পাশে কেউ নেই। মানবতার খাতিরে রক্ষা কবচহীন প্রবীণদের বেঁচে থাকার সুযোগ কি দেশের সমাজের নেতারা দিতে পারেন না? চলতি বছরে আমার তিন সাংবাদিক বন্ধুকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছি। বামফ্রন্ট সরকার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সরকারি পরিচয়পত্র আছে এমন প্রবীণ সাংবাদিকদের মাসিক দুই হাজার টাকা সাহায্য ভাতা দেবেন। জি ও বা গভর্নমেন্ট অর্ডারও ঘোষিত হয়। কিন্তু ঘোষণা কার্যকর করা হয়নি। তারপর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়া মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে প্রস্তাব পাশ করিয়ে ঘোষণা করেন অসহায় অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকদের সামাজিক সুরক্ষাখাতে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দিদি তাঁর ঘোষণা আজও কার্যকর করেননি। অথচ মোল্লা-মৌলবিদের ক্ষেত্রে তিনি দরাজ হস্তে সরকারি দাক্ষিণ্য বিলোন। এর পিছনে একটা কারণ আছে। মোল্লাদের খুশি করলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক দখলে থাকবে। দরিদ্র প্রবীণ সাংবাদিকদের ভাতা দিলে তাঁর রাজনৈতিক সুবিধাটা কী হবে? কিছুই না। মমতা তাঁর সারা রাজনৈতিক জীবনে নিঃস্বার্থভাবে কোনো কাজ করেননি। মমতা তাঁর দলের কাউকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে দলের নেতারা সবাই ষড়যন্ত্রকারী। সকলেই গোপনে দলত্যাগী মুকুল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ক্ষমতার রাজনীতি মমতার ধ্যান, জ্ঞান, জীবন। তিনি তাই নিম্নবিত্ত প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াবেন কেন? ■

ভারত ও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে রোহিঙ্গা ইস্যু সৃষ্টি করেছে পাক-সৌদি চক্র

মানস ঘোষ

স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোয় যখনই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে বা গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে বা অন্য কোনো ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, তখনই সে দেশের নাগরিক আমাদের ভূখণ্ডে এসেছে আশ্রয়ের জন্য। যেমনটা ঘটেছিল গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন চীন অনৈতিকভাবে বলপূর্বক তিব্বতে সেনা পাঠিয়ে তিব্বত দখল করে এবং তিব্বতিদের উপাসনালয়গুলো বোমা ফেলে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা তিব্বতিদের ধর্মগুরু দলাই লামাকে বন্দি করে তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। চীনাদের এই মারাত্মক পরিকল্পনার আঁচ পেয়ে দলাই লামা সপার্ষদ ও তাঁর দেড় লক্ষ অনুগামী নিয়ে ভারতে পালিয়ে আসেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ভারত দলাই লামাকে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, তিনি ও তাঁর পার্ষদরা যাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে স্বাধীন তিব্বতের জন্য কূটনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন তার জন্য তাঁকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়। হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় এই অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দলাই লামা ও তিব্বতিদের ভারতে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলো। দলাই লামাকে ভারতের সম্মানসূচক নাগরিকত্বও দেওয়া হয়। চীনা সেন্য যেভাবে তিব্বতি জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা সাধারণ ভারতীয়দের মনে চীনের বিরুদ্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা নেহরুর অজানা ছিল না। তিব্বত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে চীনের দাবিকে মান্যতা দেওয়ার কারণে চীন তিব্বতে যে হত্যা ও ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে তা নেহরু জেনেছিলেন খুব ভালভাবেই। তিনি এটাও জানতেন ভারত ও তিব্বতে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কয়েক হাজার বছরের যা দু' দেশের মানুষকে এক নিবিড় ভ্রাতৃত্বের জেরে বেঁধেছে। এটা অস্বীকার করে দলাই লামা ও তাঁর অনুগামীদের ভারতে আশ্রয় না দিলে শুধু ভারতেই তাঁর মুখ পুড়বে না, সারা বিশ্বে তাঁর ভাবমূর্তি ভীষণভাবে কালিমালিপ্ত হবে। সুতরাং অনেকটা বাধ্য হয়েই দলাই লামা ও তাঁর অনুগামীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তিব্বতি শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গটা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বামপন্থী ও বিভিন্ন মুসলমানগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল মায়ানমারের নির্যাতিত মুসলমান রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিব্বতিদের উদাহরণ টেনে বলছে ভারত যখন তিব্বতিদের আশ্রয় দিতে পারে তখন কোন যুক্তিতে ভারত বলতে পারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জায়গা এদেশে হবে না। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় পায়, তাহলে মাত্র দশ লক্ষ রোহিঙ্গাদের ভারতে জায়গা হবে না কেন? এই প্রশ্ন করেছেন হায়দরাবাদের সাংসদ ও ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এবং সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিম ও ফুয়াদ হালিমার মতো অনেকেই বলছেন ১২৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে যদি রোহিঙ্গাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেশের জনবিন্যাসে বিশেষ তারতম্য ঘটবে না। বরং তাতে ভারতের মানবিক দিকটা সারা বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রোহিঙ্গাদের ভারতীয় প্রবক্তারা ভুলে যান ভারতের নৈতিক দায়িত্ব ছিল তিব্বতিদের আশ্রয় দেওয়া। কারণ নেহরুর ভ্রান্ত চীন ও তিব্বত নীতির মাশুল হিসেবে তিব্বতিরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় নিজের দেশ পরিত্যাগ করে। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ভারতের তেমন কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই। যার জন্য তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাতে হবে। বাংলাদেশিদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারেও অনেক মুসলমান নেতা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা ভুলে যান বাংলাদেশিরা ভারতে আশ্রয় নেয় স্বাধীনতার দাবিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য নয়। মনে রাখতে হবে, যে-সব রোহিঙ্গা ধর্মগত কারণে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে তার মধ্যে প্রচুর সংখ্যক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেটের' জেহাদি দীক্ষা ও কার্যক্রমে দীক্ষিত কট্টর জেহাদি রয়েছে। তারা রাখাইন প্রদেশে বর্মি সশস্ত্র বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে বেশ কিছু সংখ্যাক সেনাকে হতাহত করে। তাদের দাবি হলো রাখাইন প্রদেশকে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি মুসলমান হোমল্যান্ডে রূপান্তরিত করতে

হবে। আর রোহিঙ্গাদের মুসলমান সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রসঙ্গটা যখন টানা হয় তখন তার বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত ভূষণের মতো রোহিঙ্গাদের প্রবক্তারা বলেন সব রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নয়।

তারা নিরীহ বলে যে প্রচার চলছে সেটা একেবারেই মিথ্যে। মমতা বা প্রশান্ত ভূষণের মতো বিজ্ঞ লোকেরা কি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন যদি রোহিঙ্গারা ভারতে আশ্রয় পায় তাহলে তারা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকবে না? তিব্বতি বা বাংলাদেশি শরণার্থীদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের কোনো তুলনা করা অনৈতিক। কারণ কী তিব্বতি কী বাংলাদেশি তারা ভারতে শরণার্থী হয়ে থাকার সময় কোনো ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়নি। বরং ভারতের স্বার্থ মাথায় রেখে সব সময় কাজ করেছে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নানান সন্ত্রাসী মুসলমান দেশ ও গোষ্ঠীর সরাসরি যোগাযোগ আছে। যেমন করাচিতে পিণ্ডির সামরিক শাসকদের নৈতিক ও আর্থিক অনুকূল্যের ভিত্তিতে রোহিঙ্গারা সালভ্যারিটি অর্গানাইজেশনের একটি মুখ্য আন্তর্জাতিক কার্যালয় খুলেছে। আর এস ও-র কাজই হলো মায়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের কট্টর মৌলবাদীতে রূপান্তরিত করা ও জেহাদি বানানো। এই সংস্থার প্রধান কলিমল্লাই ও কুদ্দুস কমান্ডার করাচিতে বসবাস করে এবং পাকিস্তানের সামরিক

> “আজকে যারা শহরে গ্রামে বড় বড় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা ব্যানার টাঙিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহ্বান জানাচ্ছে তাদের পূর্বসূরিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের হয়ে ও ভারতের বিরুদ্ধে নানান কলকাঠি নেড়েছে।”

কর্তা ও আই এস আইয়ের মতো গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি বানানোর কাজে লিপ্ত। ১৯৭৮-এ রোহিঙ্গারা যখন প্রথম বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আসে, তখন থেকেই তারা চট্টগ্রামের টেকনাফ, উখিয়া ও মন্দারবনের গভীর অরণ্যে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্প খোলে। এইসব ক্যাম্পের অস্ত্রের রসদ ও টাকার যোগান আসে সৌদি আরব ও পাকিস্তান থেকে। সেই ট্রাডিশন এখনও অব্যাহত। বাংলাদেশের কিছু সামরিক কর্মকর্তা এইসব ক্যাম্পগুলোকে আড়াল করে চালাতে সাহায্য করছে।

রোহিঙ্গা শিবিরে ত্রাণ বণ্টনের নাম করে প্রচুর জামাতি ও সৌদি এনজিও কাজ করছে। তারাই হলো রোহিঙ্গাদের আসল যোগানদার। তাদের মাধ্যমে সৌদি ও পাকিস্তানের টাকা রোহিঙ্গাদের কাছে পৌঁছচ্ছে। আসলে বাংলাদেশে জামাতে ইসলামকে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধ বাতিল করার ফলে দলটির গ্রহণযোগ্যতায় অনেকটা ভাটা পড়েছে। ফলে দলটি রোহিঙ্গা ইস্যুকে হাতিয়ার করে নিজের রাজনৈতি পুনরুত্থান ঘটাতে চাইছে। জামাত ইস্যুটিকে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগিয়ে দেশের মুসলমান জনমানসে এক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ঝড় তুলেছে যা মুসলমান ভাবাবেগে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে। রোহিঙ্গাদের সম্বন্ধে শেখ হাসিনার মনে শত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও তিনি জানেন রোহিঙ্গাদের আগমনের সুযোগ নিয়ে জামাত ও তার পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান বাংলাদেশের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্রিয় হবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান বিহারি মুসলমানদের নিয়ে যে শয়তানির খেলা খেলেছিল সেই একই খেলা খেলছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে। তাদের জেহাদি বানিয়ে রাখাইনে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাতে পুরো মদত দিচ্ছে অপরিণামদর্শী মিয়ানমারের সামরিক শাসক যারা লাগামহীন সন্ত্রাস চালিয়ে পাকিস্তান ও সৌদিদের জেহাদি কার্যক্রমকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য হলো ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে শরণার্থী বানিয়ে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে সেদেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনকে ভেঙে তছনছ করে ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে আইনের শাসনকে ধ্বংস করে, পরে সময় বুঝে শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত করে বাংলাদেশে জামাতের নেতৃত্বে ইসলাম-রাজ কায়েম করা। রোহিঙ্গাদের জেহাদি বানানোর জন্য পাকিস্তানের আই এস আই বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছে। অনেক রোহিঙ্গাযুবককে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে তালিবানের হয়ে লড়াই করতে বাধ্য করেছে। ওই যুবকদের একটি অংশ রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির সক্রিয় গেরিলা যোদ্ধা। তাদেরই জেহাদি বানিয়ে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আক্রমণ শানাতে বাধ্য করছে। আফগানিস্তান ফেরত জেহাদিরা কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে

গিয়েও ধরা পড়েছে।

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের লক্ষ্য হলো রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে ভারত ভূখণ্ডকে অস্থিতিশীল করে ইসলামের প্রসার ঘটানো। আগেই বলেছি, তাদের প্রথম টার্গেট হলো শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানানো এবং সেখানে ইসলামি শাসন কায়েম করা। এই লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে জামাত এবং বাংলাদেশে কর্মরত প্রায় শতাধিক বেসরকারি ইসলামি ত্রাণ সংস্থা, যার প্রায় পুরোটাই সৌদির পেট্রোডলারে পুষ্ট। তারা দু'হাতে টাকা বিলোচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলতে যাতে শেখ হাসিনার সরকার এক কঠিন অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়।

জামাত এবং এসব বেসরকারি সংগঠনের প্রথম লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা। তারা কৌশলে মুসলমান ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে সারাদেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে চায়। শুধু ঢাকায় নয়, দেশজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে! রাস্তাঘাটে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গালাগাল করা হচ্ছে। জামাতিরা প্রকাশ্যে বাংলাদেশের ২০ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে দেশ ছেড়ে মিয়ানমারে চলে যাবার হুমকি দিচ্ছে। বৌদ্ধ অধ্যুষিত গ্রামে জামাতিরা এই ধরনের প্রচার করছে বেশ জোরশোরে। রোহিঙ্গাদের রাখাইনে নির্যাতন ও হত্যার বদলা হলো বাংলাদেশকে বৌদ্ধশূন্য করা। হিন্দু গ্রামে গিয়ে জামাতিরা বলছে বালাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন করতে হবে। যেহেতু ভারত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেছে। জামাতিরা নিজের আখের গোছানোর লক্ষ্যে রাখাইনে গিয়ে রোহিঙ্গাদের বেশি সংখ্যায় বাংলাদেশে চলে আসতে বলছে যেখানে তাদের জন্য নিরাপত্তা, খাওয়া দাওয়া থাকা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কারণে এক এক দিনে ১০/১৫ হাজার রোহিঙ্গারা শরণার্থী ত্রাণ শিবিরে জড়ো হচ্ছে।

লন্ডন ভিত্তিক একটি ত্রাণ সংস্থা 'মুসলিম এইড' এবং অন্যান্য মুসলমান বেসরকারি এনজিও রোহিঙ্গাদের প্ররোচিত করছে। বৌদ্ধ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে সেখানকার দেশীয় উপজাতিদের ভিটেমাটিতে বসতি স্থাপন করতে শেখ হাসিনার সরকার এই বিপজ্জনক চালকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে মোকাবিলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তা কতটা সফল হবে এখনি বলা যায় না। কারণ ১০ লক্ষ শরণার্থীকে তাদের ত্রাণ শিবিরের চৌহাদ্দির মধ্যে আটকে রাখা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু তারা যদি জামাতের উস্কানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে বৌদ্ধদের জায়গাজমিতে বসবাস করতে শুরু করে তা হবে ঘৃতাহুতির সমান, যা বাংলাদেশকে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেবে। রোহিঙ্গারা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যেও ঢোকার চেষ্টা করবে। যেহেতু রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একাংশ এইডস রোগে সংক্রামিত (২০ জনের বেশি এই মারণ রোগের শিকার হয়েছে), তারা যে কোনো দেশের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। আবার এই শরণার্থীদের অনেকে ড্রাগ ও চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত যা কোনো দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।

রোহিঙ্গা আগমনে বাংলাদেশের পরিবেশ যে বিপর্যস্ত হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। টেকনাফ, কক্সবাজার এলাকার ছোটো বড় সব পাহাড়, টিলা কেটে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে যাতে সেখানে ত্রাণশিবির খোলা যায়। ধানক্ষেত উজাড় করে গড়ে উঠছে ত্রাণশিবিরের ছাউনি। শরণার্থী মহিলাদের ৬০ শতাংশ হলো গর্ভবতী এবং তারা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না। রেড ক্রসের বার্থ কন্ট্রোল কর্মসূচিকে ভেস্তে দেবার জন্য জামাত রোহিঙ্গাদের উস্কাচ্ছে, ফলে ত্রাণ শিবিরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে। এজন্য সামাজিকভাবে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলাদেশের মতো ছোটো একটি দেশের পক্ষে ১০ লক্ষ শরণার্থীকে বেশিদিন ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া শরণার্থীরা বেশি দিন আশ্রয় শিবিরে যাবার জন্য আসেনি। তারা পরিকল্পনামাফিক সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখান থেকে তারা ভারতে প্রবেশ করে উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করে এক 'মুসলমান করিডোর' স্থাপন করবে যা পাকিস্তানকে 'মুসলমান বাংলা'র সঙ্গে জুড়বে। জামাত ও পাকিস্তান মনে করে ভারতীয় মুসলমানরা এই করিডোর স্থাপনে সহায়তা করবে। বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন ওয়েইসি এবং সিপিএমের মুসলমান নেতা মহম্মদ সেলিম ও ফুয়াদ হালিম এবং প্রায় সব মুসলমান সংগঠনের নেতা এতো জোরশোরে রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে সওয়াল করছেন।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানদের কী ভূমিকা ছিল। গুটিকয়েক প্রথম সারির মুসলমান বুদ্ধিজীবী যেমন— আবু সৈয়দ আয়ুব, জাস্টিস মাসুদ ও কাইফি আজমির মতে কিছু দরদি মানুষজন ছাড়া প্রায় পুরো ভারতীয় মুসলমান সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তাদের অনেককে বলতে শুনেছি বাংলাদেশের মুসলমানরা ইন্দিরা গান্ধীর পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে। তারা আরও বলতো পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বানিয়ে পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় মুসলমানদের শেষ আশ্রয়ের স্থানটুকু কেড়ে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের নেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং বামফ্রন্টের এক প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম ইয়েজদানি সারা রাজ্য চষে বেড়িয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের স্বপক্ষে এমন এক আবেগপূর্ণ প্রচার আরম্ভ করেন যে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হন।

এপার বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কী ধরনের বিরূপতা পোষণ করতো তার এক জ্বলন্ত সাক্ষী হচ্ছেন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব হুসেন তৌফিক ইমাম। তাঁরা কথায়, 'একাত্তরের ২৫ মার্চ আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাশাসক ছিলাম। গণ্ডগোলের ভয়ে আমি আমার সাত মাসের

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দিই আমার ভাইয়ের বাড়িতে। সেখানে ভাইয়ের স্ত্রীও আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা। ঢাকায় ভয়াবহ ক্র্যাকডাউনের খবর পেয়ে তাদের ইন্ডিয়ায় চলে যেতে বলি। তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরে ঢোকে। সীমান্তে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু সেই পরিবার তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে 'যারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়তে চায় তাদের জায়গা এই বাড়িতে হবে না।' তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে এবং আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলো। অনেক আকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও তারা রাতটুকু থাকার অনুমতি দেননি। তাদের মুখে এক কথা, 'যারা গদ্দারি করে পাকিস্তান ভাঙছে তাদের জায়গা কোনো ভারতীয় মুসলমানের বাড়িতে হবে না।' সেই কথা চাউর হতে এক হিন্দু পরিবার তাদের খালি গোয়ালঘরটি ছেড়ে দেয়। আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এক হিন্দু পরিবারের গোয়ালঘরে। আমার পরিবারের চরম অভিজ্ঞতা আরও অনেক মুসলমান শরণার্থী পরিবারের হয়েছিল।'

আজকে যারা শহরে গ্রামে বড় বড় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা ব্যানার টাঙিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহ্বান জানাচ্ছে তাদের পূর্বসূরিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের হয়ে ও ভারতের বিরুদ্ধে নানান কলকাঠি নেড়েছে যাতে সেই যুদ্ধে পাকিস্তান জয়ী হয়। সুতরাং রোহিঙ্গা ইস্যুতে তারা ভারতের জাতীয় স্বার্থ না দেখে পাকিস্তান ও মুসলমানদের স্বার্থ বেশি করে দেখবে সেটাই স্বাভাবিক।

রোহিঙ্গাদের পাকিস্তান ও সৌদি আরব নিজেদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহারই করছে না, ভারতকে ঘিরে তাদের এক মারাত্মক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আছে যাতে তারা রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করতে পারে। রোহিঙ্গারা যেহেতু জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না, যে কারণে তুলনামূলকভাবে তাদের জন্মহার অত্যধিক বেশি। কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা ভারতে ঢুকিয়ে দিতে পারলে এবং এক দশকের মধ্যে তাদের বংশবৃদ্ধি এক কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। তারা ভারতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়বে। পাকিস্তানের আরও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য 'মুসলমান করিডোর' নিয়ন্ত্রণে তারা এক নিয়ামক ভূমিকা নিতে পারবে। ভুলে গেলে চলবে না রোহিঙ্গাদের ভারত বিরোধিতা ও পাকিস্তান প্রীতির এক কলঙ্কজনক ইতিহাস আছে। দেশভাগের সময় রোহিঙ্গারা মুসলিম লিগের অন্ধ সমর্থক হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৩০ সালে পাকিস্তানের মূল প্রবক্তা আল্লাম ইকবালের আমন্ত্রণে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ সম্মেলনে রোহিঙ্গারা যোগ দেয় এবং লিগের মূল দাবি উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড— সেটাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। দেশ ভাগের সময় রাখাইন প্রদেশকে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্রিটিশ শাসক ও মহম্মদ আলি জিন্নার ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু জিন্না সেই দাবি নাকচ করে দেন। তাঁর ভয় ছিল রোহিঙ্গারা যদি পাকিস্তানের অংশ হয় তাহলে জনসংখ্যার নিরিখে পূর্ব পাকিস্তান আরও বেশি মাত্রায় সংখ্যাগুরু হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান পূর্বের ওপর তার কর্তৃত্ব হারাবে।

বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্থপতি জেনারেল আউং সাং মুসলিম লিগের প্রতি রোহিঙ্গাদের আনুগত্য প্রদর্শন ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়ায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা যেমন ভারতের বিভাজন চেয়েছিল সেই একই যুক্তিতে ভবিষ্যতে তারা বার্মার বিভাজন চাইতে পারে। যে কারণে রোহিঙ্গাদের বার্মার প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে বর্মী নেতারা শুরু থেকে সন্দিহান, যা ক্রমশ সাধারণ বর্মীদের জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রোহিঙ্গাদের প্রতি এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে মিয়ানমারে। যার ফলে রোহিঙ্গারা রেঙ্গুনের নীতি নির্ধারকদের কাছে আজও বৈষম্যের শিকার।

রোহিঙ্গাদের পাকিস্তান, সৌদি আরব ও ইসলামিক স্টেট বা আই এস পরিকল্পনা মাফিক বাংলাদেশে ঢোকাচ্ছে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বোড়ে হিসেবে তাদের চাল চালার জন্য, মায়ানমারে ফিরে যাবার জন্য নয়। সুতরাং রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ওতপ্রতোভাবে জড়িত। শেখ হাসিনার এই কঠিন সময়ে ভারতের দায়িত্ব হলো তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মায়ানমারের জুন্টার ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ইয়াঙ্গুনকে বাধ্য করা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে। আমাদের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঢাকায় গিয়ে এই কথাটি বেশ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন। একাত্তরের যুদ্ধের সময় ভারত যেভাবে বাংলাদেশের হয়ে বিশ্ব জুড়ে দূতিয়ালি করেছিল এখন ঠিক সেই ভাবেই রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর কাজটা ভারতকে করতেই হবে। কারণ এটাতেই দু'দেশের মঙ্গল। না হলে বাংলাদেশে জামাত-খালেদা জুটি ক্ষমতায় চলে আসবে। সেটা হলে দুটি দেশের সামনে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে। ■

একাত্তরের যুদ্ধের সময় ভারত যেভাবে বাংলাদেশের হয়ে বিশ্ব জুড়ে দূতিয়ালি করেছিল এখন ঠিক সেই ভাবেই রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর কাজটা ভারতকে করতেই হবে। কারণ এটাতেই দু'দেশের মঙ্গল।

মগের মুলুক থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা

সুজয় চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শব্দটি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশের (বার্মা) আরাকান প্রদেশের বাসিন্দা। এই আরাকান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। তবে তা শুধুমাত্র তার ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত মিলের জন্য নয়, বরং এর ঐতিহাসিক কারণও আছে। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত হলেও 'আরাকান পর্বতমালা' আরাকানকে ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সমুদ্রপথেই আরাকান সহজে যাতায়াত করা সম্ভব। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী হওয়ার ফলে দীর্ঘদিন আরাকানে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ইতিহাসকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে, যা ব্রহ্মদেশের বাকি অংশের ইতিহাস পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রোহিঙ্গাদের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের বাংলা ভাষার প্রচুর মিল ও তাদের সংস্কৃতি মধ্যযুগের বাংলাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ বিশেষ।

এখন প্রশ্ন হলো, এই রোহিঙ্গারা কারা ও কেন তারা বিতাড়িত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরাকানের ইতিহাসে। আরাকানে প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। আরাকানের বাসিন্দারা বিশ্বাস করে যে তাদের ইতিহাস শুরু ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আগে। চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে আরাকানে 'ধান্যবতী' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটে। এই সময়কার ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত লিপি, যা আরাকানে পাওয়া যায়, তার থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে বুদ্ধের জন্মের অনেক অনেক আগে থেকে আরাকানে ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল ও সংস্কৃত চর্চা হতো। ধান্যবতী রাজ্যের সঙ্গে চীন, পারস্য, শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ, বিশেষত প্রাসাদ, শহর ও জীবনযাত্রার মান এখনও পর্যটকদের মুগ্ধ করে। ধান্যবতী রাজ্যের পতনের পর বৈশালী রাজ্যের উত্থান হয়, যার শাসন ছিল ভারতীয় চন্দ্র রাজবংশের হাতে। চন্দ্র রাজবংশের প্রায় সকল মুদ্রা সংস্কৃতে খোদাই করা, যার একপিঠে 'ষাঁড়',

যা এই বংশের প্রতীক এবং অপর পিঠে 'শ্রীবৎস' খোদিত। চন্দ্র রাজারা ৮১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। এরপর অনেক উত্থান পতনের পর মধ্যযুগে 'ম্রাউক উ' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়কে আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বর্ণযুগ বলে মনে করে।

এই 'ম্রাউক উ' রাজাদের সময় বাংলায় মগদের আক্রমণ শুরু হয়। মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করে মগদের দমন করেন। মগরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও তাদের রাজার আদেশে মগ নৌবহর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। মগদের সঙ্গে তৎকালীন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য জলদস্যু যোগ দিয়ে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলে, যা এক সময় বঙ্গোপসাগরের ত্রাস ছিল। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের সেনাবাহিনী আরাকান জয় করে। এই সময় থেকে স্বাধীন আরাকান রাজ্যের অবসান হয়। 'ম্রাউক উ' রাজ্য বা মগদের রাজ্যের মূল ধর্ম ছিল বৌদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘকাল বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার আরাকান রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানদের সময় এটি নামেমাত্র করদ রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা নিজেদের বাংলার মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তুলনা করত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নবম শতাব্দী (৯০০ এ.ডি.) থেকে নিজেদের ইতিহাসের সূচনা ধরে। এই সময় আরব ও পারস্যের মুসলমান ব্যবসায়ীরা আরাকানে বাণিজ্যিক বসতি শুরু করে। তারা স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ মেয়েদের বিয়ে করে ও ধর্মান্তরিত করে এক নতুন জনগোষ্ঠীর জন্ম দেয়, যাদের বংশধররা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মধ্যযুগে আরাকান রাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মান্তরকরণের ফলে প্রচুর হিন্দু বৌদ্ধ এই জনগোষ্ঠীতে যোগ দেয়। এরা এক সময় রাজদরবারে বাংলা, আরবি ও ফারসি লেখক হিসাবে কাজ করত। মুঘলদের চট্টগ্রাম জয়ের পর বৌদ্ধ মগদের একটি বৃহৎ অংশ মুসলমান হয়। রোহিঙ্গা ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ রাখাইনদের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয় ব্রহ্মদেশের আরাকান জয়ের পর থেকে। ১৭৯৫ সালে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সেনাবাহিনী আরাকান জয় করে, আর ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশের রাজার কাছ থেকে আরাকান ছিনিয়ে নেয়। ১৮৮৬ সালের মধ্যে পুরো ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ শাসনে

চলে আসে। ব্রহ্মদেশের সেনা আরাকান জয় করার পর যেসব মুসলমান রোহিঙ্গা আরাকান থেকে পালিয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল তারা আবার ফিরতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনে আরাকানে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সেখানকার ভূমিপুত্র বৌদ্ধ রাখাইন জনগোষ্ঠী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের সঙ্গে রোহিঙ্গা বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের দূরত্ব তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে রোহিঙ্গারা জিন্নার পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করায় এই দূরত্ব হিংসার চেহারা নেয়, যদিও জিন্না নিজে আরাকানের এই দাবি সমর্থন করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনী বর্মা দখল করলে ব্রিটিশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। জাপানিদের পক্ষে ছিল আরাকানের জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ জনসাধারণ ও ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল রোহিঙ্গা ও বাঙালিরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মার জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ জনসাধারণকে কোণঠাসা করার জন্য ব্রিটিশরা 'V-Force' গঠন করে, যার মূলে ছিল ব্রিটিশ অনুগত রোহিঙ্গা মুসলমানরা। ১৯৪২ সালের দাঙ্গা যা মুসলমান রোহিঙ্গা ও বৌদ্ধদের মধ্যে ঘটে, তা ছিল মূলত ব্রিটিশদের রোহিঙ্গা তোষণের ফল। এই দাঙ্গায় প্রায় ২০,০০০ বৌদ্ধ ও ৫০০০ রোহিঙ্গা মুসলমান প্রাণ হারায়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পুরো ব্রহ্মদেশে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। যার ফলে প্রচুর মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এই বৌদ্ধ-রোহিঙ্গা দাঙ্গাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঙালি হিন্দুরা। যারা বৌদ্ধদের কাছে ব্রিটিশ অনুগত বলে পরিচিত ছিল। বাঙালি হিন্দু যারা ব্রিটিশ আমলে বর্মাতে বিভিন্ন ব্যবসা খুলে বসেছিল তারা ভারতে পালাতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাপানের পরাজয় ঘটে ও ব্রিটিশরা তাদের পুরোনো কলোনিগুলি যা জাপানের দখলে ছিল ফিরে পায়। ১৯৪৮ সালে বর্মার স্বাধীনতার পর থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব হারায় ও অত্যাচারের শিকার হতে থাকে। ১৯৬২ সালে Westmister style-এর রাজনীতির অবসান ঘটে ও বর্মাতে মিলিটারি শাসন শুরু হয়। প্রায় সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার ভারতীয় বর্মা ছাড়তে বাধ্য হয়। জেনারেল নে উইন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে Operation King Dragon শুরু করেন। এই নে উইন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিদের সমর্থক ছিলেন, ফলে মারাত্মক ব্রিটিশ বিদ্বেষ তাঁর রক্তে ছিল। ব্রিটিশ অনুগত রোহিঙ্গাদের বর্মাছাড়া করার জন্য তিনি শাসনতন্ত্রেও বদল আনেন। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা এই সময় আরাকান ছেড়ে বাংলাদেশে ও অন্যান্য জায়গায় আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ করলেও United Nations-এর চাপে পড়ে কিছু রোহিঙ্গাকে আরাকানে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় বটে কিন্তু কয়েক বছর পর ১৯৮২-র Myanmar Nationality Law বা জাতীয় আইনে রোহিঙ্গাদের Citizenship বা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। এই আইন বর্মার আটটি জাতীয় জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেয়। যথা— বামার, চীন, কায়িন, কায়া, মন, রাখাইন, সান। এর মধ্যে মূল জনগোষ্ঠী হলো বামার বা বামা, যারা বর্মার ইতিহাসকে প্রায় ১০০০ বছর ধরে পরিচালিত করে আসছে। ৭০০ সালের পর বর্মার প্যাগান সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে ব্রিটিশদের বর্মা জয় অবধি বর্মার ইতিহাস আসলে বামারদেরই ইতিহাস। এরা বর্মার ভাষা ও বর্তমান সংস্কৃতির স্রষ্টা। বর্তমানে বামার জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, বার্মা নামটিও বামার শব্দ থেকে এসেছে। যদিও অনেকে মনে করেন এটি ব্রহ্মদেশের অপভ্রংশ। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সান ৯ শতাংশ, কারেন ৭ শতাংশ, রাখাইন (আরাকান) ৪ শতাংশ ও মন ২ শতাংশ অন্যান্য ১০ শতাংশ। বর্মার ১৯৮২ সালের আইন ভারতীয়, চীনা, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়নি। এদের বহিরাগত বলেই ধরা হয়। প্রায় বেশিরভাগ ভারতীয় ও চীনা জেনারেল নে উইন-এর সামরিক শাসনকালে বর্মা থেকে বিতাড়িত হয়। একই অবস্থা ঘটে রোহিঙ্গাদেরও। স্বাধীনতার পর বর্মার এই নতুন জাতীয়তাবাদের পেছনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অবদানও কম নয়। উল্লেখ্য, এই দেশের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ হীনযান ধর্মাবলম্বী।

অন্যান্য ধর্মের মধ্যে খ্রিস্টান ৬.২ শতাংশ ও মুসলমান ৪.৩ শতাংশ। নে উইনের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম, যা এক সময় বর্মার সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে রাজনৈতিক ঐক্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৮, ১৯৯৯-৯২, ২০১২, ২০১৫, ২০১৬-১৭ সালগুলিতে বর্মার সরকার ক্রমাগত রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করেছে। বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত-সহ, তাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব এমনকী নেপালেও রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মোট জনসংখ্যা এখন ১, ৫৪৭, ৭৭৮ থেকে ২০ লক্ষের কাছাকাছি। ২০১৩ সালে United Nations রোহিঙ্গাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' হিসাবে ধরে বা মনে করে। কারণ এদের সংস্কৃতি ও ভাষা চট্টগ্রামের বাঙালি সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি। মগদের বংশধর আরাকানের রোহিঙ্গারা এমন 'মগের মুলুক' ত্যাগ করেছে। 'মগের মুলুক' শব্দটির অর্থ মগদের দেশ যেখানে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই আছে। আমরা এখনও এই প্রবাদটি অস্থিরতা, শৃঙ্খলাহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বোঝাতে ব্যবহার করি। প্রবাদটি মধ্যযুগে মগদের অত্যাচার ও তার ফলে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে মনে করায়। মধ্যযুগে মগদের, পর্তুগিজদের, ওলন্দাজদের ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের অত্যাচারে মূল ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঙালি হিন্দুরা, আজও তাই। রোহিঙ্গা-বৌদ্ধ রাখাইন এবং বর্মা সরকারের লড়াইয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি হিন্দুরা, যারা একসময় বর্মাতে নিজেদের ব্যাবসায়িক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষে বাঙালি হিন্দুরাও বিতাড়িত। কিন্তু আজ বর্মাতে বাঙালি হিন্দুদের অবদান নিয়ে ইতিহাস লেখার কেউ নেই। মায়ানমারের বৌদ্ধ নাগরিকদের চোখে এরা ব্রিটিশদের অনুগত বলে পরিচিত ছিল। অতএব ঘৃণার পাত্র। যদিও এই বাঙালি হিন্দুরাই প্রাচীনকাল থেকে আরাকানের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের অবদান বাদ দিয়ে আরাকানের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। ▮

পশ্চিমবঙ্গে শুধু ডেঙ্গি নয় দাঙ্গাও মহামারীর আকার ধারণ করেছে

একলব্য রায়

প্রথা ভেঙে জি নিউজের মতো সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম তুলে না ধরলে বসিরহাট, বাদুড়িয়া কালিয়াচক, ধুলাগড়, ইলামবাজার, ক্যানিং, দেগঙ্গার দাঙ্গার কথা মানুষ জানতেই পারতো না। দাঙ্গার চেহারা যত বীভৎসই হোক না কেন হিন্দুদের আক্রান্ত হওয়ার খবর করলে দাঙ্গা আরও বাড়বে এই অছিলায় সংবাদমাধ্যম নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, সত্য গোপন করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আক্রান্ত হলে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। সংখ্যালঘু বিপন্ন বলে তিল কে তাল বানিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এই ধরনের প্রথা মেনে চলাই এদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' 'প্রগতিশীলতার' পরাকাষ্ঠা বলে চিহ্নিত। ধীর গতিতে হলেও অনেক প্রভাবশালী মিডিয়া এখন সত্য গোপনের এই কুপ্রথার জাল কেটে বেরিয়ে আসার প্রয়াস করছে। পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া অবশ্য এখনো সেই তিমিরেই। এবার কালীপুজোর কয়েকদিন আগে হিন্দু সমাজকে নিশানা করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জ্বলে ওঠা দাঙ্গার আগুন আরও একবার প্রমাণ করে দিল চোখ বন্ধ করে রেখে প্রলয় ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলে দিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্যে সাতচল্লিশের সেই ভয়াবহ দিনগুলি আবার ফিরে আসছে না তো?

মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থান খলিসামারি কোচবিহার জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। গত ১৬ অক্টোবর সকালবেলা উঠে মানুষ দেখলো স্থানীয় কালীমন্দিরের ভিতরে রক্ত, গোরুর কাটা পা ফেলে রাখা হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এর কয়েকদিন আগে বর্তমান ঘটনাস্থল থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে পঞ্চানন মোড়ে একটি কালীমন্দিরের বিগ্রহ বিকৃত করা হয়েছিল। উত্তেজিত হিন্দু জনতা পথ অবরোধ করলে, এক মাসের মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হবে, প্রশাসনের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে অবরোধ উঠে যায়। এই ঘটনার কোনো সুরাহা না হতেই আবার নতুন ঘটনা ঘটে যাওয়াতে উত্তেজনার পারদ চরমে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হিন্দু জনতা পথে নামে। মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে ব্লক সদর শীতলখুচি পর্যন্ত রাজ্য সড়কের বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ স্থলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা গেলে এমন জনরোষ তৈরি হয় যে তারা প্রাণ রক্ষার তাগিদে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হন। উত্তেজনা ছড়ায় বিভিন্ন এলাকায়। এই দিন সন্ধ্যায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বড়মরিচায় লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয় শিবমন্দির, লুটপাট চালানো হয় হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোসাইহাট, ডাকালিহাট, ডাকঘড়া, কাউয়ারডারা, সাঙ্গারবাড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে উত্তেজিত জনতা মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদ ও দোকানপাটেও ভাঙচুর চালায়। এবার সক্রিয় হয়ে উঠে পুলিশ। হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ পথ অবরোধ হটানোর জন্য শুরু হয় পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ, নিক্ষেপ করা হয় কাঁদানে গ্যাসের শেল। এর পর শুরু হয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে একতরফা পুলিশি নির্যাতন, ধরপাকড়। পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে শিতলখুচি ব্লকের হিন্দুগ্রামগুলি পুরুষশূন্য হয়ে যায়। রাত নামলেই তল্লাশির নামে এলাকার হিন্দু বাড়িগুলিতে চলতে থাকে পুলিশের উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব। অসুস্থ ও নাবালকদের তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশের তরফ থেকে জামিন অযোগ্য সুয়োমোটো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে।

ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের তৎপরতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রচুর মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়। এই মিথ্যে মামলাগুলিতে অভিযুক্তদের তালিকায় সঙ্ঘ বিজেপি-সহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হিন্দুদের চেয়েও বেশি সংখ্যায় রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উপাসনা স্থলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও হিন্দুরা থানায় অভিযোগ জানাতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় মুসলমান নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের দিয়ে অভিযোগ দায়ের করানোর পাশাপাশি থানায় গেলেই হিন্দুরা গ্রেপ্তার হবে এই বার্তাটিও হিন্দুদের কাছে পৌঁছানোর কাজে সক্রিয় ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত কিছু মুসলমান যুবক ঘটনার শুরুতেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা রটাতে শুরু করে যে হিন্দুরাই নাকি মন্দিরে গোমাংস রেখে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শানিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা ছড়ানোর জন্য পুলিশ এই মুসলমান যুবকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফেসবুকের কিছু পোস্টেও দেখা গেছে বোরখা পরা কয়েকজনের কৃত্রিম ছবি যাদের হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে 'হিন্দুরাই বোরখা পরে মন্দিরে গোমাংস ছড়িয়েছে'। মাথাভাঙ্গা শীতলখুচির তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতার রাশ সম্পূর্ণ ভাবে মুসলমান নেতাদের হাতে থাকার জন্য দাঙ্গা কবলিত এলাকায় হিন্দুরা প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচার চাইতেও যেতে পারেনি।

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল শীতলখুচির ঘটনা দাঙ্গা নয় আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা। প্রশ্ন উঠছে, ডেঙ্গিতে মৃত্যু হলে ডাক্তারবাবুরা যেমন মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গি লিখতে পারেন না ঠিক তেমনি প্রশাসনের উপরও কি এমন ফতোয়া জারি করা হয়েছে যে দাঙ্গা হলেও তাকে আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা বলে চালাতে হবে? ■

তাজমহল আসলে শিবমন্দির

ড. প্রসিত রায়চৌধুরী

জনশ্রুতি, শিল্পশোভার সার অনবদ্য 'তাজমহল' সৌধটি যমুনার তীরে নির্মাণ করেছিলেন বাদশা শাহ্‌জাহান। শাহ্‌জাহানের প্রেমময়ী রূপসী বেগম আর্জুমান্দ বানুর (মমতাজ) মৃত্যু হয় ৩৮ বছর বয়সে ১৪টি সন্তানের জন্ম দিয়ে। আগ্রা থেকে ৬০০ মাইল দূরে বুরহানপুর নগরে (খ্রি. ১৬৩০)। বুরহানপুর থেকে মমতাজ বেগমের দেহ এলে তাজমহল তৈরি করা হয়। নুরজাহানের ভাইঝি মমতাজ ছিলেন এক আমিরের বিবি। শাহ্‌জাহান আমিরকে বাধ্য করেন মমতাজকে 'তালাক' দিতে (১৬১২)। এসব তথ্য পাওয়া গেছে মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে। কিন্তু শাহ্‌জাহানের দরবারি লেখক ও হুমায়ুনের ভগ্নী তাঁদের 'বাদশানামা' ও 'হুমায়ুন নামায়' লিখেছেন— 'পানিপথ যুদ্ধজয়ী বাবর, এই শৈব মন্দির ভবনে বাস করেছিলেন (১৫২৬)। তাঁর পৌত্র শাহজাহান ছিলেন মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রাহক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে 'সারাসেনিক' শিল্প সমৃদ্ধ হর্ম্যরাজির সৃষ্টি। মন্দির ভবনকে পত্নীর নামাঙ্কিত তাজমহলে রূপান্তরিত করতে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে হিরা, চুনি, পান্না সংগ্রহ করেন। সুযোগ্য শিল্পী ও কারিগর (হিন্দু ও মুসলমান) নিযুক্ত করেন। শিল্পী কারিগরদের মাসিক বেতন ছিল হাজার টাকা। পারস্যের সিরাজ নগর থেকে বিখ্যাত চিত্রকর হামিদনুদ খাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন শাহ্‌জাহান। রাজপুতানা থেকে শ্বেত ও পীত পাথর, সিংহল (শ্রীলঙ্কা) থেকে মুক্তা, চীন দেশ থেকে স্ফটিক, সূর্যকান্ত ও অয়সকান্ত মণি এবং নর্মদা নদী থেকে প্রবাল অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে সংগৃহীত হয়। যেসব শিল্পী কারিগর, সৌধমন্দিরের নির্মাণকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা পরীক্ষা করতে বাদশা কতকগুলি থলে ঝুটো মুক্তা মণি ও কতকগুলি থলে আসল মণিমুক্তায় ভরে শিল্পীদের হাতে দেন যমুনায় নিক্ষেপ করতে। যেসব শিল্পী আসল নকল চিনতে ভুল করে তাদের বরখাস্ত করেন বাদশাহ। যারা নকল মণিমুক্তার থলি নদীজলে ফেলেন তাঁরাই সৌধ নির্মাণে নিযুক্ত হন।

সৌধটি একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর নির্মিত। উত্তর দক্ষিণে একশত ফুট পূর্বপশ্চিমে প্রায় দু' হাজার ফুট। পাথরের মিনার স্তম্ভ। মধ্যস্থলের সৌধের চূড়ায় প্রকাণ্ড গম্বুজটি যেন নীল আকাশে মাথা ঠেকিয়ে বাদশা শাহ্‌জাহানের বেগম-প্রেম ঘোষণা করছে নীরবে শোকাহত হয়ে। চারদিকে লাল পাথরের সুউচ্চ পাঁচিল। উঠানে রয়েছে ফোয়ারা, ফুলের বাগান আর কুঞ্জবন। সৌধের নীচের তলায় বেগম মমতাজের সমাধি। সবার উপরে থাকে বাদশা শাহ্‌জাহানের দেহ। শবাধারে।

যেখানে যে মণিমাণিক্য মানায় তা গ্রথিত করা হয়েছে। মূল্যবান পাথর দিয়ে সৌধের গায়ে নানা রঙের ফল পাতা ও পুষ্পরাশির বাহার দর্শকদের বিস্মিত ও হতবাক করে। লতাপাতা ও ফুলগুলি এমন ভাবে তৈরি যে মনে হয় কোনো চিত্রশিল্পীর আঁকা। দরজার উপর, দেওয়ালের গায়ে সাদা মার্বেল পাথরে কোরানের বাণী খোদাই করা আছে। মনে হয় এই মর্মর ফলকগুলি পরবর্তীকালে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাজমহলের বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে অভ্যন্তরের শোভা আরও চিত্তাকর্ষক। মহলে প্রবেশের তোরণ থেকে সমস্ত দেওয়াল গাত্র জালিকাটা সূক্ষ্ম কারুকার্যে মণ্ডিত। দেওয়ালের গায়ে কৃত্রিম জানলা দরজা এবং লতাপাতা গাছ ও ফুল এমন ভাবে অঙ্কিত যে এগুলি সবই স্বাভাবিক বলে ভ্রম হয়। মনে হয় সত্য সত্যই যেন খোলা জানলা দিয়ে সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে। সেখানে চরছে— গোরু ছাগল মেষ। পাশে বয়ে যাচ্ছে স্রোতে ভরা আঁকা বাঁকা নদী। এক ইউরোপীয় পর্যটক কয়েকটা পাখি এনে ছেড়ে দিয়েছিল। পাখিগুলো পাথরের ঘাসফুলের উপর বসে ঠোকরাচ্ছিল। ঠগি, ঠ্যাঙাড়ে, দমনকারী কর্নেল স্লিম্যান সাহেব একবার তাঁর মেমসাহেব স্ত্রীকে নিয়ে তাজমহল দেখতে এসেছিলেন। মেমসাহেব তাজমহল দেখে হতবাক। তার শোভা

তাজমহলের অলঙ্করণ : ধুতরোফুল ও আমপাতা

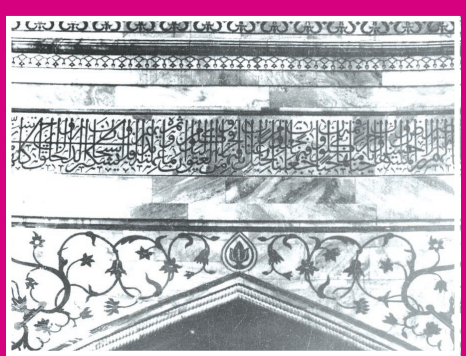

পদ্মফুল

সৌন্দর্যে মূর্ছা যাবার উপক্রম।

স্বামীকে জানালেন--- তিনি (মেমসাহেব) মরলে তাঁর কবরের উপর স্মিম্যান সাহেব যদি এমনি অপূর্ব সুন্দর সমাধিমন্দির তৈরি করে দেন— তবে এখনই তিনি মরতে প্রস্তুত। 'তাজমহল' সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস—

"একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

তাজমহল শাহ্‌জাহানের তৈরি এ ধারণা পাল্টে যায় একটি পত্র অবিষ্কারে। পত্রটি বিশুদ্ধ ফার্সি জবানে রচিত। লেখক বাদশা পুত্র আওরঙ্গজেব। তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার (১৬৫২ খি.)। পত্রে জানাচ্ছেন, —জাঁহাপনা, যে মন্দিরে মমতাজ বেগম সমাধিস্থ— তার ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। কারণ প্রাসাদটি প্রায় পাঁচশত বছরের পুরাতন'। (১১৬২ খ্রি.—১৬৫২ খ্রি.)। এক মারাঠি গবেষক পি. এন. ওক তথ্য প্রমাণ দিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন, বললেন— 'তাজমহল, কবরস্থান হলে— এটি হতো চারকোণা। এর প্রবেশপথ হতো— পশ্চিমমুখী। কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী সাচ্চা মুসলমান কবর, মাজার, মসজিদ পশ্চিমমুখী করে তৈরি করে না। কারণ পশ্চিমে আরব দেশে 'মক্কা' আছে। ধর্মগুরু মহম্মদের আবির্ভাব স্থান মক্কায়। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মন্দির হয় আটকোণা। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ— বায়ু, অগ্নি, ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি। মন্দির হয় দক্ষিণমুখী। আর শীর্ষে থাকে ত্রিশূল। গম্বুজের মাথায় থাকে ফলক— পিতলের বা সোনার। দক্ষিণমুখী 'তাজমহল' শীর্ষে আজও ত্রিশূল দর্শনীয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন— তাজমহলের গোলাকার গম্বুজের মাথায় ছিল পিতলের ফলক। তাজমহল শীর্ষের ত্রিশূল শিবমন্দিরের। শিবের নাম 'চন্দ্রমৌলেশ্বর।' তাজমহলের নাম ছিল 'তেজমহাবলাশয়'। মুসলমান লেখকরা সংস্কৃত শব্দকে ফার্সিতে বদল করেছেন। আওরঙ্গজেবের পত্রে জানা যায়, তাজহমল হলো 'মহাতির উদ্যান। এই উদ্যানে আছে কেবল বেলগাছ। যার পাতা শিব পূজায় প্রয়োজন। কবরে ত্রিশূল থাকে না। মধ্যযুগে মুসলমান স্থাপত্য বিদ্যার কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাজমহল নির্মাণে কোনো মুসলমান মিস্ত্রি, কারিগর কাজ করেনি। নির্মাণকাজ হিন্দু কারিগরদের। তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় তখন বোমা পড়েছে। (ডিসেম্বর ১৯৪২)। মন্বন্তর শুরু হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল তাজমহলের গম্বুজে ফাটল ধরেছে। বৃষ্টির জল হুহু করে ঢুকে পড়ছে গর্ভগৃহে। চিন্তিত হলো ভারত সরকার। তখন ইংরেজ আমল। বিলাত ফেরত সাহেব ইঞ্জিনিয়াররা কোনো ভাবেই মেরামত করতে পারলো না। মালকোঁচামারা খাটো ধুতিপরা, মাথায় পাগড়ি, পাকানো পাকা গোঁফওয়ালা একটি লোক এসে জানালে সে ফাটল মেরামত করতে পারে। কী মশলা দিয়ে ফাটল সারাবে তা বলতে চায় না। বলে তার পূর্বপুরুষ এই মন্দির তৈরি করেছিল। সে জানে কীভাবে ওই মন্দির গাঁথা হয়েছিল। অবাক কাণ্ড, সেই গেঁয়ো অশিক্ষিত হিন্দু মিস্ত্রি নাম পূরণচাঁদ তাজমহলের ফাটা দেওয়াল মেরামত করে দিলেন। তখন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বাঙালি মন্ত্রী ছিলেন--- মহাবিদ্বান ড. শ্যামাপ্রসাদ। তিনি, তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে অনুরোধ করে এই গ্রাম্য হিন্দু মিস্ত্রিকে রায়সাহেব উপাধি ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়ে দেন। তাজমহল যে হিন্দুমন্দির তার একটা বড় প্রমাণ চারটি সরু লম্বা বুরুজ এগুলি তাজমহল সংলগ্ন নয়। তাজমহল সমাধিসৌধ বা মসজিদ হলে স্তম্ভগুলি সৌধসংলগ্ন হতো। কবিগুরুর ভাবোচ্ছ্বাসে শাহ্‌জাহান একনিষ্ঠ মহাপ্রেমিক, কিন্তু বাদশাহ ছিলেন বহুকামী, নিষ্ঠুর স্বার্থপর। কোনো কোমল বৃত্তি তাঁর ছিল না। তাঁর পাশব প্রেমের নিদর্শন আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনে চোদ্দটি সন্তান আর্জুমন্দ বেগমকে উপহার দেন। বড় ভাই খসরুকে গলা টিপে হত্যা করেন। খসরুর ছেলে বাঙ্গত খাঁ ও ছোট ভাই শাহারিয়রকে জলে ডুবিয়ে মারেন।

তাজমহলে আছে অতিথি ভবন, রক্ষীদের ঘর, অতিথিশালা, নাকড়াখানা (নহবত ও বাদ্যঘর) এগুলি চুন, বালি, পাথর দিয়ে গেঁথে ভরাট করে দর্শকদের চোখের আড়ালে রেখে গেছেন শাহ্‌জাহান। তবে প্রখ্যাত স্থপতি হ্যাভেল সাহেব তাজমহলের স্থাপত্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন— 'তাজমহল হিন্দু স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন'। ভারতবর্ষে সারাসোনিক স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে যে মসজিদগুলি দেখানো হয়— তা হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর মাত্র। কাশীর (বারাণসী) মন্দিরের পশ্চাৎদিকে— শঙ্খ, ঘণ্টা, পদ্ম খোদিতরূপে আজও বিদ্যমান। কোরান থেকে ফারসি বয়েত মর্মর ফলকে খোদাই করে দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মির বাকিকে দিয়ে বাবর রামমন্দির ধ্বংস করে ধাঁচা গড়েন (১৫২৯)। বাবরি নামের এই ধাঁচা চূর্ণ হলে (১৯৯০) দেখা যায় ভিত্তিমূলে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন।

শাহ্‌জাহানের আমলকে (১৬২৭-১৬৫৭) অর্ধশিক্ষিত প্রাকৃতজন--- 'স্বর্ণোজ্জ্বল' বলে থাকেন। শাহ্‌জাহানের ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে ২৯ বছর যুদ্ধ অভিযানে রাজকোষ শূন্য হয়েছে। ১২ বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। জিজিয়া কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুদের উপর। অথচ গৌরবময় গুপ্ত রাজত্বে মহাকবি কালিদাস, গণিতবিদ অমর সিংহ, জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের আবির্ভাব। সে সময় অজন্তা, ইলোরার অনবদ্য শিল্প, সাঁচী, সারনাথ এবং দিল্লিতে লৌহস্তম্ভ গড়ে উঠেছে। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা , ও দন্তপুরীর মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাসত্র হিন্দু আমলেই সম্ভব হয়েছে। এশিয়া খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (নালন্দা, বিক্রমশীলা) বিদেশি দস্যু তুর্কি আমলে ধ্বংস হয়েছে। দুর্বৃত্ত নরপশু দস্যু মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে। ১৫০টি উটের পিঠে হিরা মুক্তা স্বর্ণ লুণ্ঠন করে ভারতকে নিঃস্ব করেছে। সোমনাথ মন্দির ধ্বংস ও শিবলিঙ্গ চূর্ণ করে গজনির মসজিদের সিঁড়ি তৈরি করেছে যাতে ধর্মভীরু মুসলমানরা তা মাড়িয়ে উঠতে পারেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করে যেমন ভারতের ইতিহাসকে প্রসারিত করেছেন, তেমনি প্রখ্যাত গবেষক পি. এন. ওক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন তাজমহল আসলে শিবমন্দির। ■

তাজমহলের উপেক্ষিত ইতিহাস

সন্দীপ চক্রবর্তী

তাজমহল কে নির্মাণ করেছিলেন? সারা পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর জানেন। কিন্তু উত্তরটা যে সঠিক নয়, সে কথা লেখক-গবেষক পি.এন.ওক তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেইসঙ্গে তাজমহল সম্পর্কে সমগ্র উত্তর ভারতে বহুল প্রচলিত এক জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা প্রমাণেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তাজমহল প্রকৃতপক্ষে শিবমন্দির। এখানে অধিষ্ঠান করতেন অগ্রেশ্বর মহাদেব। যাঁর লৌকিক নাম নাগনাথেশ্বর। শাহ্‌জাহান গায়ের জোরে দখল করেন মন্দিরটি। এই নিবন্ধে তাজমহলের নির্মাতা হিসেবে শাহজাহানের নাম কেন বিবেচনা করা উচিত নয় সেটাই আলোচনা করব।

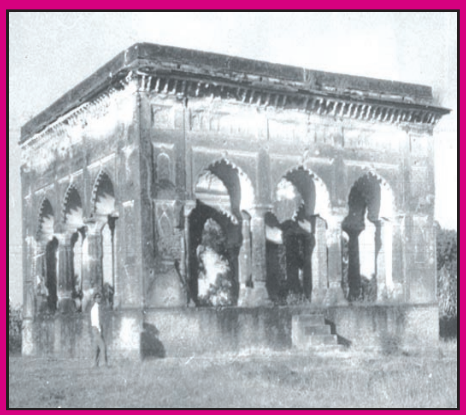

আহুমহল : মুমতাজের প্রকৃত সমাধি।

তাজের প্রবেশপথ : স্থাপত্যে হিন্দুরীতি

তাজমহলের নাম :

(১) অওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত মুঘল দরবারের কোনও নথিপত্রে তাজমহলের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পরে তাজ-ই-মহল নামটি নথিভুক্ত হয়। এখন যা তাজমহলে রূপান্তরিত।

(২) তাজমহলের 'মহল' শব্দটি ইসলামি শব্দকোষের অনুমোদিত শব্দ নয়। আফগানিস্তান থেকে আলজিরিয়া— ইসলামি বিশ্বের কোনও বাড়ি বা প্রাসাদের নামে 'মহল' শব্দের ব্যবহার হয় না।

(৩) বলা হয়, শাহ্‌জাহানের পত্নী মুমতাজ মহলের নাম থেকে তাজমহল কথাটির উৎপত্তি। কারণ তাজমহল শাহ্‌জাহান-পত্নীর সমাধিক্ষেত্র। কিন্তু এই যুক্তি ধোপে টেকে না। শাহ্‌জাহানের পত্নীর নাম মুমতাজ মহল নয়, মুমতাজ-উল-জামানি। তাছাড়া, মুমতাজ মহল থেকেই যদি তাজমহল কথাটির উৎপত্তি হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, মুমতাজের 'মুম'টা গেল কোথায়?

(৪) মুমতাজ বানানে শেষ অক্ষর 'জ' (ইংরেজি Z)। তাহলে 'তাজে'র ইংরেজি বানানে 'Z' থাকা উচিত। অথচ আমরা জানি তাজের ইংরেজি বানানটি হলো TAJ।

(৫) একাধিক ইউরোপীয় পর্যটক (শাহ্‌জাহান এবং অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে) ভারত ভ্রমণে এসে তাজ-ই-মহলের প্রকৃত উৎসের সন্ধান দিতে তেজ-ও-মহালয়ার কথা বলেছেন। যা ছিল সে সময়ের বিখ্যাত শিবমন্দির। আনুমানিক দশম শতাব্দে স্থাপিত এই শিবমন্দিরের কথা আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জানতেন।

(৬) যদি ধরেও নেওয়া হয় তাজমহল একটি সমাধিক্ষেত্র, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে, সমাধিক্ষেত্রের নামের শেষে কীভাবে 'মহল' কথাটি যুক্ত হতে পারে? মহল মানে বিত্তবৈভবময় জাঁকজমকে ভরা প্রাসাদ। দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'তাজ' ও 'মহল' দুটোই সংস্কৃত শব্দ। শাহ্‌জাহান আরবি-ফারসি বাদ দিয়ে হঠাৎ সংস্কৃত ভাষায় বেগমের সমাধির নামকরণ করতে গেলেন কেন?

(৭) ইউরোপিয়ান পর্যটকের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, তাজমহল আগে ছিল শিবমন্দির, নাম তেজোমহালয়। এখানে আগ্রার রক্ষক এবং আরাধ্য অগ্রেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠান করতেন। তার প্রমাণ, এখনও তাজমহলের ভেতরে প্রবেশ করার আগে জুতো বাইরে খুলে রাখতে হয়। এটা কোনও আইন নয়। সামাজিক রীতি, যা বহু বছর ধরে চলে আসছে। মন্দির থেকে মকবরা হয়ে যাবার পরেও তা পাল্টায়নি। তাজমহল যদি শুধুই সমাধি হতো তাহলে জুতো খুলে ভেতরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। মুমতাজের তথাকথিত সমাধি রয়েছে তাজমহলের বেসমেন্টে। যে স্ল্যাবের ওপর এই সমাধি

প্রতিষ্ঠিত তার গায়ে কোনও অলংকরণ নেই। অথচ সুপারস্ট্রাকচারের বাকি তিনটি স্ল্যাবের গায়ে অলংকরণের ছড়াছড়ি। শাহ্‌জাহান তাঁর পত্নীর মূল সমাধিস্থলকে একরকম বঞ্চিত করে তাজমহলের অন্যান্য অংশ ছবিতে ছবিতে ভরিয়ে দিলেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

অনেকেরই ধারণা, স্ল্যাবটি সরালে এখনও অগ্রেশ্বর মহাদেবের দেখা মিলবে। কিন্তু এ কাজের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, সেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এ ব্যাপারে নীরব। তাজমহলের মেরামতির কাজে যেসব মিস্ত্রি বা কারিগর যুক্ত তাঁরাও কেউ কেউ বলে থাকেন, তাজমহলের পিছন দিকে বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে যা শাহ্‌জাহানের আমল থেকেই বন্ধ। পর্যটকদের সেখানে যাবার অনুমতি নেই। মিস্ত্রিদের মধ্যে কেউ কেউ মেরামতির সময় ওইঘরে বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ দেখেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে মোট বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গম্ রয়েছে। তার মধ্যে এগারোটির কথা সকলের জানা থাকলেও একটি একেবারে বেহদিশ। ওই একটিই তেজোমহালয়ার নাগনাথেশ্বর। আগ্রায় পূজিত হন বলে তিনি অগ্রেশ্বর মহাদেব। কেউ কেউ চন্দ্রমৌলেশ্বরও বলে থাকেন। নাগনাথেশ্বরে শিবের সর্প-অবতার। আগ্রার প্রবীণ মানুষেরা নাগনাথেশ্বরের কথা জানেন। আগে আগ্রার মানুষ শ্রাবণ মাসে পঞ্চশিবের আরাধনা করতেন— বালকেশ্বর, পৃথিবীনাথ, মনকামেশ্বর, রাজারাজেশ্বর এবং নাগনাথেশ্বর। তেজোমহালয় মুঘলরা ছিনিয়ে নেবার পর নাগনাথেশ্বরের পুজো আর হয় না।

তথ্যপ্রমাণ :

(৮) শাহ্‌জাহান তার বাদশাহ্‌নামায় (পৃ. ৪০৩, প্রথম খণ্ড) স্বীকার করেছেন মুমতাজের সমাধি নির্মাণের জন্য একটি অসাধারণ সুন্দর চূড়াবিশিষ্ট ('ইমারৎ-এ-আলিশান ওয়া গম্বেজ') প্রাসাদ নেওয়া হয়েছে। দিয়েছেন জয়পুরের মহারাজা সোয়াই জয়সিংহ। সে সময় প্রাসাদটি মানসিংহের প্রাসাদ নামে পরিচিত ছিল।

(৯) ১৬৫২ সালে অওরঙ্গজেব শাহ্‌জাহানকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আদাব-ই-আলমগিরিতে এই চিঠির উল্লেখ রয়েছে তিনবার। এছাড়া এর উল্লেখ পাওয়া যায় ইয়াদগারনামা এবং মুরক্কা-ই-আকবরাবাদি (সম্পাদনা সৈয়দ আহমেদ, আগ্রা ১৯৩১, পৃ. ৪৩, পাদটীকা ২) গ্রন্থে। চিঠিতে অওরঙ্গজেব লিখেছিলেন, মুমতাজ বেগমের সমাধি নির্মাণের জন্য যে প্রাসাদ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত পুরনো। সাত তলার ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। মূল গম্বুজের উত্তর দিকেও ফাটল দেখা দিয়েছে। এখনই সংস্কার করা প্রয়োজন। এই চিঠি থেকে প্রমাণ হয় মন্দির-প্রাসাদ থেকে মকবরায় রূপান্তরিত হবার সময়েই তাজমহল যথেষ্ট পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তার সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সদ্য নির্মিত হলে এরকম হতো না।

(১০) জয়পুরের প্রাক্তন মহারাজাদের ব্যক্তিগত তথ্যপঞ্জী 'কপড়দোয়ারা' সংগ্রহে এখনও শাহ্‌জাহানের স্বাক্ষরিত নির্দেশ (১৮ ডিসেম্বর, ১৬৩৩) সংরক্ষিত রয়েছে। নির্দেশটি তাজ মন্দির-প্রাসাদ হস্তান্তর সম্পর্কিত। বিষয়টি এতই অস্বস্তিকর যে জয়পুরের কোনও শাসকই তা জনসমক্ষে আনেননি।

(১১) রাজস্থানের স্টেট আর্কাইভে রক্ষিত আরও তিনটি আদেশনামার কথা জানা যায়। প্রত্যেকটিই শাহ্‌জাহানের এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়পুরের মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন মুমতাজের সমাধি নির্মাণ এবং তাতে কোরানের বাণী খোদাই করার জন্য ভালো মার্বেল পাথর পাঠাতে। স্বাভাবিকভাবেই জয়পুরের মহারাজা এতে ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ক্ষোভের অন্য কারণও ছিল। একে তো শাহ্‌জাহান জাট-রাজপুতদের গর্ব তেজোমহালয় অন্যায়ভাবে দখল করে মন্দিরকে মকবরায় রূপান্তরিত করেছেন তার ওপর আবার এহেন অশিষ্টাচার। তাই তিনি মার্বেল পাঠাতে অস্বীকার করেন।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ :

(১২) **তেভার্নিয়ে :** তেভার্নিয়ে ফ্রান্স থেকে ভারতে এসেছিলেন শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে। পেশায় ছিলেন স্বর্ণকার। তিনি লিখেছেন, শাহ্‌জাহান ইচ্ছে করেই তাজ-ই-মকানের (তাজ মন্দির-প্রাসাদ) কাছে মুমতাজের সমাধি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ সে সময় বিদেশিরা তাজ-ই-মকান দেখার জন্য ভিড় জমাত। সমাধি এর কাছাকাছি হলে বিদেশিরা সেটাও দেখবে এবং শাহ্‌জাহানের অমর প্রেমকথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তেভার্নিয়ে লিখেছেন, তাজমহল তৈরি করতে যা খরচ হয়েছিল তার থেকে বেশি হয়েছিল জোগাড়যন্ত্র করতে। শাহ্‌জাহানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তেজোমহালয় শিবমন্দির লুটপাট করা, শিবলিঙ্গ তুলে সেখানে মুমতাজের সমাধি প্রতিস্থাপিত করা। মন্দিরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য স্থানে এত সম্পদ ছিল যা খুঁজে বের করে আত্মসাৎ করতে শাহ্‌জাহানের ২২ বছর সময় লেগেছিল বলে তেভার্নিয়ে লিখেছেন।

(১৩) **পিটার মান্ডি :** ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ১৬৩২ সালে। উল্লেখ্য, পিটার মান্ডি ভারতে আসার কয়েক মাস আগেই মুমতাজের মৃত্যু হয়েছে। তিনি তখনই আগ্রায় তাজ-ই-মহল দেখেছিলেন। ভ্রমণ বিবরণীতে তিনি তাজের চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য-সহ চিত্তাকর্ষক গম্বুজ, বাগান এবং তাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাজারের কথা লিখেছেন। কিন্তু তাজমহলের মতো একটি স্মৃতিসৌধ কি কয়েকমাসে তৈরি করে ফেলা সম্ভব? এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় তাজ-ই-মকান শাহ্‌জাহান সিংহাসনের বসার অনেক আগে থেকেই ছিল।

(১৪) **দে লায়ে :** নেদারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। এই পর্যটক তার বিবরণীতে আগ্রা দুর্গ থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত মানসিংহের বিস্ময়কর প্রাসাদের কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, এই প্রাসাদ ছিল শাহ্‌জাহান-পূর্ববর্তী সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ বাদশাহ্‌নামা থেকে জানা যাচ্ছে মানসিংহের প্রাসাদেই মুমতাজের সমাধি প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল।

(১৫) **বার্নিয়ে :** ফরাসি পর্যটক। লিখেছেন, মানসিংহের প্রাসাদের দখল নেবার পর শাহ্‌জাহান তাজ-ই-মহলের বেসমেন্টে অ-মুসলমান দর্শনার্থীদের ঢুকতে দিতেন না। এখানেই ছিল শিবমন্দির। বার্নিয়ে লিখেছেন, তাজ-ই-মহলের দরজা ছিল রুপোর তৈরি, রেলিং সোনার, ছাদের সিলিং থেকে শিবলিঙ্গের মাথা পর্যন্ত মুক্তো ঝুলত। শাহ্‌জাহান প্রাসাদটি দখল করেছিলেন এই বিপুল বৈভব আত্মসাৎ করার জন্য।

বন্ধ ২২ কুঠুরির একটি : হিন্দু অলঙ্করণ

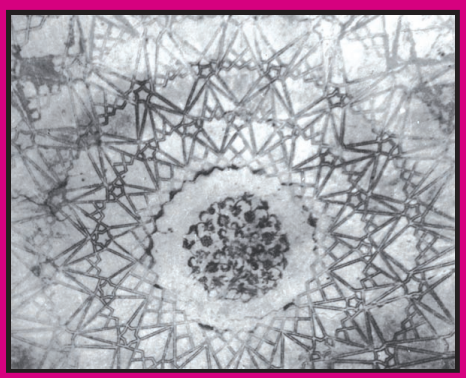

তাজের শিলিংয়ে হিন্দু অলঙ্করণ

(১৬) **জন অ্যালবার্ট ম্যানডেলস্লো :** এই পর্যটক কোথা থেকে এসেছিলেন তা জানার উপায় নেই কিন্তু তার রচনা থেকে অনেক কিছু জানা যায়। ম্যানডেলস্লো ভারতে এসেছিলেন ১৬৩৮ সালে, মুমতাজের মৃত্যুর সাত বছর পর। তিনি তার গ্রন্থে (ভয়েজেস অ্যান্ড ট্রাভেলস টু ওয়েস্ট ইন্ডিজ, প্রকাশক : জন স্টারকি এবং জন বাসেট, লন্ডন) তৎকালীন ভারতের অনেক কথা লিখেছেন কিন্তু তাজমহলের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। অথচ তাজমহল নির্মাণ শুরু ১৬৩১ সালে। শেষ হয় ১৬৫৩-তে।

(১৭) প্রাচীন সংস্কৃত অনুশাসন থেকে জানা যাচ্ছে, তাজ-ই-মহল ছিল শিবমন্দির। অনুশাসনটির সাধারণ নাম বটেশ্বর অনুশাসন, যা এখন লক্ষ্ণৌ জাদুঘরে সংরক্ষিত। অনুশাসনের বয়ান অনুযায়ী, 'দুধসাদা মন্দিরটি এতই সুন্দর যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিব আর কৈলাসে ফিরে যাননি।' অনুশাসনের সময়কাল ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরগাত্রে খোদিত অনুশাসনটি পরবর্তীকালে শাহ্‌জাহানের নির্দেশে খুলে নেওয়া হয়।

তাজমহলের স্থাপত্য :

(১৮) ইউরোপের বিখ্যাত স্থপতি ই.বি. হ্যাভেল, শ্রীমতী কেনয়ার এবং স্যার ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টারহেভের বক্তব্য : তাজমহলের গঠনশৈলী হিন্দু মন্দিরের মতো। এই প্রসঙ্গে হ্যাভেল জাভার চণ্ডী সেবা মন্দিরের উল্লেখ করেন, যার গঠনশৈলী অবিকল তাজমহলের মতো।

(১৯) চতুষ্কোণিক বেদীর চারপাশে মার্বেল পাথরে তৈরি চারটি স্তম্ভ হিন্দু বাস্তুরীতির প্রমাণ। এই স্তম্ভগুলি সাধারণত রাতে আলোকস্তম্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার দিনের বেলায় এগুলোই হয়ে ওঠে প্রহরীদের নজর রাখার কেন্দ্র। হিন্দুদের পুজোয় মঙ্গলঘটের চারপাশে সমদূরত্বে চারটি পাটকাঠি মাটিতে পুঁতে লাল সুতো দিয়ে ঘিরে রাখার রীতি আছে। হিন্দুদের বিবাহেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়।

(২০) তাজমহলের বিশেষ অষ্টকৌণিক গঠন এর হিন্দু স্থাপত্যের আর একটি প্রমাণ। সারা পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুরাই আটটি দিকের কথা স্বীকার করে। প্রতিটি দিকের জন্য নির্দিষ্ট একজন দিক্‌পাল আছেন। যে কারণে হিন্দুদের দুর্গ, শহর প্রাসাদ এবং মন্দিরের নির্মাণ পরিকল্পনায় অষ্টকৌণিক গঠনশৈলী বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। যদিও হিন্দুদের শাস্ত্র অনুযায়ী দিক দশটি। কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যায় দিক আটটি ধরা হয়।

(২১) তাজমহলের চূড়ায় তিনটি ফলা বিশিষ্ট মোটিফটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ত্রিফলার মাঝখানের অংশে রয়েছে একটি কলস। তার দুদিকে দুটি আমপাতা এবং একটি নারকেল। আর রয়েছে চাঁদ। তবে তা ইসলামি চাঁদ নয়, শিবের জটায় অবস্থানকারী চন্দ্রকলা। এটা যে একটি হিন্দু প্রতীক তা বলাই বাহুল্য। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে এই প্রতীক সকলেরই চোখে পড়বে। এছাড়া তাজমহলের দেওয়ালে কোরানের বাণীর (যা পরবর্তীকালে খোদাই করা হয়েছে) ঠিক নীচেই রয়েছে পদ্মফুলের ছবি দেওয়া বিশেষ অলংকরণ। তিন ফলা বিশিষ্ট যে মোটিফটির কথা বলা হয়েছে তা অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি। এতে মরচে পড়ে না। মন্দিরের মতো পবিত্র স্থানে অষ্টধাতুর ব্যবহার হিন্দুদের বহু প্রাচীন রীতি।

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে তাজমহল শাহ্‌জাহান তৈরি করেছিলেন, এ কথা মিথ্যে। তিনি দখল করেছিলেন, লুটপাট করেছিলেন, ইসলামিকরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়ে ছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীকে রাজনীতির সোপান বানিয়েছিলেন। যা এতকাল ভারতবর্ষ বোঝেনি। এখন গবেষণার মান অনেক উন্নত হয়েছে।

সব থেকে বড়ো কথা গবেষণার দিশা বদলেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মসজিদ মিনার মকবরার প্রকৃত প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হবে।

এই সময়

বেগুনে বোমা

জার্মানির কার্লস্রুহে শহরের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে হঠাৎ ফোন। এক অশীতিপর বৃদ্ধ

জানালেন, তিনি বাড়ির বাগানে একটি না-ফাটা বোমা দেখেছেন। বোমাটি সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। পুলিশ গিয়ে দেখল বোমা নয়, বেগুন। দেখতে অবশ্য বোমার মতো।

বেচারা চোর

চোর বাবাজি রেস্তোরাঁর জানলা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য, রাতের

অন্ধকারে ভল্ট ভেঙে যথাসর্বস্ব হাতিয়ে কেটে পড়া। কিন্তু কপাল মন্দ! জানলাতেই আটকে থাকতে হলো সাত ঘণ্টা। উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডের।

বিরাট, তখন

আশিস নেহরার হাত যার কাঁধে তাকে কি

চিনতে পারছেন আপনারা? বেশ কয়েক বছর আগে একটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আশিস নেহরার হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছিল ছেলেটি। তারই অধিনায়কত্বে আশিস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন। ছেলেটির নাম, বিরাট কোহলি।

মালদায় শীতশয্যা বিতরণ

গত ২২ অক্টোবর মালদা জেলার সেবা বিভাগের উদ্যোগে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থা 'গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্ট'-এর নামে শীতশয্যা বিতরণ করা হয়। জেলার অমৃতি খণ্ডের বিনপাড়ায় এবং পুরাতন মালদা খণ্ডের কামঞ্চ গ্রামে মোট ১০০টি পরিবারের হাতে একটি করে কম্বল ও মশারি তুলে দেওয়া হয়। মালদা শহরের ভূমিপুত্র বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী দু'জন অনাবাসী ভারতীয় তাদের সদ্য প্রয়াত পিতা স্বর্গীয়

প্রতুল কুমার কুণ্ডুর স্মৃতিতে জিনিসগুলি দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁরা সপরিবার সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে গ্রামে উপস্থিত হয়ে নিজ হাতে দুঃস্থ মানুষদের হাতে তা তুলে দেন। বিতরণে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস, জেলা প্রচার প্রমুখ অঙ্কুর দাস প্রমুখ।

শিবপুর কল্যাণ আশ্রম শাখার বনযাত্রা

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখা একটি দীর্ঘ বনযাত্রার আয়োজন করে সংলগ্ন ওড়িশা রাজ্যে। ৬ থেকে ৯ অক্টোবর এই বনযাত্রা ঝাড়সুগুদায় শুরু হয়ে দেওগড়, সুন্দরগড়, সম্বলপুর হয়ে ৭০০ কিলোমিটার প্রত্যন্ত বনবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল পরিক্রমা করে। প্রথম দিনেই স্থানীয় কল্যাণ আশ্রমের সক্রিয় সহযোগিতায় 'সাধুপাল' অঞ্চলের মহিলারা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ গড়ে তুলে কীভাবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন তা বনযাত্রীরা প্রত্যক্ষ করেন। প্রায় ১ কিলোমিটার পথ সাঁওতালী নাচের তালে বনযাত্রীদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরের দিন বনযাত্রীরা 'খেলকুঁদ কেন্দ্রের' অনুশীলনকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। এই বনাঞ্চল থেকেই উঠে এসেছিলেন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া তীরন্দাজ লিম্বারাম। বিপুল উৎসাহে কবাডি খেলা দেখার পর আশ্রমের অন্তর্গত 'বোনাই' অঞ্চলে মেয়েদের হস্টেলে আবাসিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, নাচগান, প্রার্থনার পর সহভোজে অংশগ্রহণ।

৯ তারিখ শেষদিনে বনবাসী কিশোররা শিব সেজে চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করে। তারা জেলাস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বহু পুরস্কার পায়। স্বনিযুক্ত শিক্ষক তাঁর পাঠ দান করেন। ওই দিন সুন্দরগড় জেলার তালিমুণ্ডা গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের এক উদ্যোক্তার আতিথেয়তা গ্রহণ করা হয়। এখানে সরকারি কৃষি দপ্তরের আমলারা সদস্যাদের উন্নত চাষ, বীজ, কীটনাশক সম্পর্কে হাতে কলমে বোঝালেন। কল্যাণ আশ্রমের সহায়তায় চলা এই কেন্দ্র সব কেন্দ্রীয় সাহায্যের লাভ নিয়েছে। এখানে বিনামূল্যে ওষুধ

এই সময়

রাখে কৃষ্ণ

ট্রাক চাপা পড়েছিলেন। বাইক-সুদ্ধ তাকে বেশ কয়েক মিটার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল

ট্রাকটি। ভাগ্যের জোরে তিনি ট্রাকের ব্লাইন্ড জোন (যেখানে ড্রাইভার দেখতে পায় না) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। তারপর বেমালুম গট গট করে হেঁটে চলে যান। যেন কিছুই হয়নি। ঘটনাটি চীনের।

যুবরাজ

তিনি ভুটানের যুবরাজ। বয়েস ১ বছর। নাম গেইলসে ওয়াংচুক। সম্প্রতি বাবা-মা'র সঙ্গে দিল্লিতে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

তাকে ফুটবল উপহার দিয়েছেন। সুষমা স্বরাজ গাল টিপে আদর করেছেন। নির্মলা সীতারামন দিয়েছেন কর্ণাটকের পুতুল।

খিচুড়ি

খিচুড়ি কি ভারতের জাতীয় খাদ্য হতে চলেছে? খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী হরসিমরত

কাউর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত দেননি। জানা গেছে, খিচুড়ি ভারতের সর্বত্র খাওয়া হয়। সর্বস্তরের মানুষ খিচুড়ি ভালোবাসেন। তাই কেন্দ্র খিচুড়িকে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলতে চায়।

সমাবেশ -সমাচার

বিতরিত হয়। অ্যাম্বুলেন্স আছে। জানা গেল সুন্দরগড়ের ২৪ হাজার গ্রামে ৬০ শতাংশ খ্রিস্টান। এর মধ্যে ৬ হাজার গ্রামে কল্যাণ আশ্রমের কাজ দৃঢ় ভাবে প্রভাব ফেলেছে।

মূলত মুণ্ডা, কিষান, খেড়িয়া, ওঁরাওদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছেন প্রচারক ও ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী রাজেন্দ্র মাদেলা। বনযাত্রাটি ছিল গান, কুইজ আর হাস্য কৌতুকে নির্মল আনন্দময়।

স্বস্তিকা পাঠকদের উদ্যোগে বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন

গত ২৯ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠকদের উদ্যোগে বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বাঘাযতীন পাবলিক হলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ। শ্রী বিশ্বাস ও শ্রী সেন বাংলায় জাতীয় ভাব প্রসারে স্বস্তিকার গত ৭০ বছরের নিরলস প্রয়াসের উল্লেখ করেন। শ্রীমতী বৈদ হিন্দিভাষীদের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগরণে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য পত্রিকার উল্লেখ করেন। পরে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশিত হয়।

চাঁচলে ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন ও রক্তদান শিবির

মালদা জেলার চাঁচলে বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় গত ২৮ অক্টোবর। নিবেদিতার প্রতিকৃতি উন্মোচন ও মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন সভার সভাপতি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আশুতোষ মণ্ডল। নিজ হস্তে অঙ্কিত নিবেদিতার প্রতিকৃতি তিনি বিদ্যালয়ে প্রদান করেন। বিদ্যালয়ের

এই সময়

বিড়ম্বনা

বাংলাদেশের এক অটো ড্রাইভারের ফোন নম্বর একটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন সেই ব্যক্তি বিড়ম্বনায় পড়েছেন। রাতদিন

নায়কের মহিলা ভক্তদের ফোন আসছে। স্ত্রী ভুল বুঝে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বিয়েটাই না ভেঙে যায়!

তুঙ্গে খাদি

দেশে খাদি বস্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৬ সালে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে খাদির বিক্রি ছিল ৪২৯.৯৩ কোটি টাকা। এ বছর ওই

একই সময়ে খাদির বিক্রি পৌঁছেছে ৮১৩.৮৬ কোটি টাকায়। বৃদ্ধি ৮৯ শতাংশ। তথ্য : বস্ত্রমন্ত্রক।

বঙ্গে ডেঙ্গু

মশা দেখলেই বাঙালি এখন ভয় পাচ্ছে। অনেকে বলছেন বাসে-ট্রামেও যদি মশারির

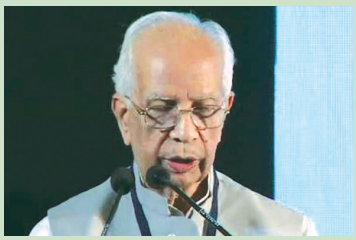

ব্যবস্থা থাকত তাহলে ভালো হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী রাজ্য সরকারকে বাস্তবানুগ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। দেখা যাক অনুরোধে কাজ হয় কিনা!

সমাবেশ -সমাচার

ভাইবোন এবং আচার্য আচার্যাদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আচার্য উৎপল সরকার রচিত কোরাস গান পরিবেশিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে

নিবেদিতার শিল্পী জীবনের উপর আলোকপাত করেন। রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। ২১ জন রক্তদান করেন। রক্তদানে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনকে সার্থক করে তোলে। উপস্থিত ছিলেন কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ।

মালদহে দুর্গাবাহিনী বর্গ

দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তি মহিলাদের মধ্যে সাহস নির্মাণ ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার কাজ করে চলেছে। অখিল ভারতীয় যোজনানুসারে সাত দিনের প্রান্তীয় প্রশিক্ষণ শিবির হয় মালদা জেলার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে। বর্গে ৮টি জেলার ৩০টি গ্রাম থেকে ৯৬ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকে নিযুদ্ধ, দণ্ড, আসন, ব্যায়যোগ, প্যারেড খেলা-সহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন। অখিল ভারতীয় মাতৃশক্তি প্রমুখ ডাঃ সঙ্গীতা ৭ দিনই উপস্থিত থেকে মায়েদের মধ্যে চর্চা, বৌদ্ধিকের মাধ্যমে পথনির্দেশ

করেন। সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা সত্যনারায়ণ মজুমদার, পরিষদের প্রান্তীয় সভাপতি প্রকাশ চক্রবর্তী এবং প্রান্ত সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার উপস্থিত ছিলেন।

আরোগ্য ভারতী কলকাতা শাখার ধন্বন্তরী পূজা

গত ১৭ অক্টোবর ধন ত্রয়োদশীর দিন শ্রীশ্রী ধনন্তরী দেবের জন্ম তিথি অনুসারে আরোগ্য ভারতী কলকাতা মহানগরের উদ্যোগে কেশব ভবনে ধনন্তরী পূজার আয়োজন করা হয়। ২৫ জন অংশগ্রহণকারী-সহ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, আরোগ্য ভারতীর হাওড়া মহানগরের সভাপতি শৈলেন্দ্র সিংহ, সম্পাদক দীপক দুবে এবং কলকাতা মহানগরের সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়শ্রী রক্ষিত।

ভারতবর্ষে এই প্রথম অপুষ্টি রোধে মোদী সরকার মোকাবিলায় নেমেছে

অতিথি কলম

অমিতাভ কান্ত

সম্প্রতি জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (NFHS-4) পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রজন্ম ব্যাপী অপুষ্টির একটি ধারা চলেছে অর্থাৎ যে মা সন্তান প্রসব, করল সেই মা যেমন অপুষ্টির শিকার সদ্যোজাত শিশুটিও তাই। ভারতে মা ও শিশুর মধ্যে রক্তাল্পতা রয়েছে। প্রতি তিনটি শিশুর একটি অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন। এদের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজনের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। অন্যদিকে নবজাতকদের মধ্যে প্রতি দু'জনের একজন মাত্র প্রথম ৬ মাস মায়ের দুধ পায়। এগুলি অত্যন্ত চিন্তাজনক বিষয় যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হওয়ায় নিরসনের চেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

দীর্ঘ অপুষ্টির ফলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সেই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং এদের কর্মদক্ষতা তুলনামূলকভাবে কম হয়। তারা সহজে নানা রকম রোগের শিকারও হয়ে পড়ে। সেটা আজ চিকিৎসক ও আগ্রহীজন মাত্রই জানেন। NFHS-4 সমীক্ষা মোতাবেক আমাদের ভবিষ্যতের কর্মী সম্পদ প্রত্যাশিত ক্ষমতার থেকে ৪০ শতাংশ কম উৎপাদক হবে। এটি শারীরিক ও বৌদ্ধিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই পুষ্টির বিষয়টিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব না দেওয়া হলে তরুণ জনসংখ্যার সর্বাধিক অধিকারী হয়েও ভারত তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হবে। অপুষ্টির এই প্রভাব আবার বিশেষ কিছু অঞ্চলের ওপর তীব্র, যেমন পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি এমন ২০১টি জেলায় বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর শতকরা হিসেবে উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে। সেখানে ৫৩ জন অপুষ্টির শিকার। বিহারে এই সংখ্যা ৩৬ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ২৭ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ১৭, রাজস্থানে ১১। এই রাজ্যগুলিতে যদি পরিকল্পিত ভাবে অপুষ্টি দূরীকরণের কাজ করা যায় তাহলে তা দেশের উন্নতির সহায়কই হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের সব থেকে দ্রুত কিছু করণীয় আছে : (১) সুষম খাদ্য, (২) শুদ্ধ পানীয়জল, (৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা ও স্বচ্ছতাকে দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসে পরিণত করা।

সরকারের তরফে নেওয়া ন্যাশনাল হেলথ মিশন (NHM), ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে (ICDS) স্বচ্ছ ভারত ও জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এটা পরিষ্কার যে অর্থের অভাব কোনো বাধা নয়। এরই সঙ্গে সদ্য চালু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধন' যোজনায় যে কোনো গর্ভবতী মহিলা (অবশ্যই শর্তাধীন) ও প্রসূতির ক্ষেত্রে উভয়ের যথাযথ প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর যত্ন নেওয়ার জন্য মায়ের ব্যাঙ্ক খাতায় সরাসরি টাকা জমা পড়ে যাচ্ছে। অপুষ্টির সঙ্গে লড়াইয়ে এগুলি যথোপযুক্ত প্রকল্প হলেও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিছু ব্যবহারিক পরিবর্তনও দরকার।

জেলা স্তরে এই ব্যবস্থাগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ খুবই জরুরি। কেন্দ্রীয় স্তরে অপুষ্টিকে যেমন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূল স্তরেও সেরকমই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সকল শিশুর খাদ্যাভ্যাসকে সুষম করতে আধার যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান তৈরি করা প্রয়োজন যেটি রাজ্য থেকে জেলা হয়ে ব্লক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে অপুষ্টি রয়েছে কিনা তা সহজেই নজরে আসবে ও ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে লাগু থাকা আই সি ডি এস প্রকল্পে গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জন্য ১০৩৩২ টাকা মূল্যের ৪৫ মাসের উপযোগী রেশন দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই প্রকল্প নিয়ে নানা ক্ষোভ শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই রেশনের মাত্রা কম হয়ে যায়, কখনও বা জিনিসের গুণগত মান ঠিক থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলকভাবে মায়ের ব্যাঙ্ক খাতায় টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থারও দরকার আছে।

> "
> 'স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্প সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে পরিবর্তন অভিমুখী একটি প্রকল্প যার রূপায়ণ চলেছে দ্রুততম গতিতে। শৌচালয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতায় সম্পূর্ণ সাফল্য পেতে এত দ্রুত কোনো দেশ কাজ করতে পারেনি। আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার এই সাফল্যের ফলে ভারতে অপুষ্টি ও সুষম আহার গ্রহণ করার প্রশ্নে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসছে।
> "

ফঃ ৪

তৃতীয়ত মধ্যপ্রদেশে সুপরিচালিত 'সুপোষণ ও স্নেহ শিবির' ওড়িশার 'আমি ভি পারিবু', ছত্তিশগড়ের 'নভযতন' প্রকল্পগুলির সাফল্য অনুসারী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থত, হাসপাতালে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ধাতৃঅঙ্গনগুলিতে গিয়ে প্রসবের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানিক প্রসব হলেও শিশু জন্মানোর ১ ঘণ্টার মধ্যে তাকে মাতৃদুগ্ধ পানের পরিসংখ্যান কিছু মাত্র ৪১ শতাংশ। এক্ষেত্রে শিশুর প্রথম ৬ মাস অবধি কেবলমাত্র স্তন্য পান করানোর সচেতনতা বাড়ানো ভীষণ জরুরি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অভ্যাস যদি আবশ্যিকভাবে গড়ে তোলা যায় সেক্ষেত্রে ভারতে অন্তত ১ লক্ষ ৫৬ হাজার শিশুমৃত্যু রোধ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও প্রসূতির প্রয়োজনীয় নানারকম ভিটামিন ও খনিজ খাদ্য যা প্রোটিন ও অন্যান্য নানান ঘাটতির সঙ্গেই রয়ে গেছে তার দূরীকরণের ব্যবস্থাও নেওয়া দরকার। এটি একটি বহুমুখী প্রকল্প।

WHO-এর তথ্য অনুযায়ী অপুষ্টির কয়েকটি মূল কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে বারংবার পেট খারাপ করা বা ডায়রিয়া বা অন্ত্রে নানা রকমের কৃমি-কেঁচোর আক্রমণ-জনিত সংক্রমণ। এগুলি হয় মূলত অস্বাস্থ্যকর কিছু অভ্যাসের জন্য। যেমন খাবার আগে হাত না ধোওয়া, শৌচকর্মের ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্নতা এবং দূষিত জল খাওয়া। এগুলির ফলে রোগ ও রোগের প্রভাবে শরীর দুর্বল হওয়ায় প্রয়োজনীয় সুষম খাবার যার ফলে শরীরের বৃদ্ধি ঘটবে তা গ্রহণ করার ক্ষমতা শৈশবে বা কৈশোরেই নষ্ট হতে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে করা সমীক্ষা অনুযায়ী কেবলমাত্র পর্যাপ্ত শৌচকর্মের অভাব ও ঠিকভাবে হাত না পরিষ্কার করার ফলে বছরে ৫০ হাজারের বেশি শিশুমৃত্যু হয়। এ বিষয়ে ভারত একটি লজ্জাকর পরিসংখ্যানের বিরল সম্মানপ্রাপ্ত। বিশ্বের খোলা জায়গায় মলত্যাগকারীদের সংখ্যার ৬০ শতাংশই ভারতে। এই সবিশেষ অপরিচ্ছন্নতার দিকটি প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মানসিকতায় পরিবর্তন আনার সঙ্গে ব্যাপক শৌচাগার নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন। এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া তাঁরই পরিকল্পনা। বিগত তিন বছরে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প যথেষ্ট গতি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শৌচালয়ের ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ৩৯ শতাংশ ক্ষেত্র আওতায় থাকার জায়গায় বর্তমানে ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি NICEF-এর তরফে 'স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব গ্রামীণ পরিবারগুলির ওপর কীরূপ পড়েছে তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। সংস্থা ১২টি রাজ্যের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছে তার মধ্যে যে পরিবারগুলি খোলা স্থানে মলত্যাগ করছে না তাদের বাৎসরিক চিকিৎসা খরচ গড়ে ৫০ হাজার টাকা বেঁচে যাচ্ছে, সঙ্গে বাঁচছে সময় ও অনেক ক্ষেত্রে জীবন। শেষমেশ এর ফলে পরিবারটির বাস্তবে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, কেননা খরচ বাঁচছে।

এখানেই শেষ নয়। একই ভাবে আমেরিকার Bill & Milinda Gates Foundation ৫টি রাজ্যে একেবারে নির্দিষ্ট করে যারা খোলা জায়গায় মলত্যাগ (open defecation free) করে না এমন গ্রাম ও মলত্যাগ করে এমন গ্রামের মধ্যে তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, খোলা জায়গায় মলত্যাগের গ্রামের শিশুরা শৌচালয়ে মলত্যাগ করা গ্রামের শিশুদের থেকে ৪৬ শতাংশ বেশি পেটের রোগে ভুগছে। OD (খোলা স্থানে মলত্যাগ) গ্রামের শিশুদের ক্ষেত্রে শৌচালয়ে মলত্যাগী গ্রামের তুলনায় ৭৮ শতাংশ মলপোকা পাওয়া গেছে। ১৭ শতাংশ বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে আর ৫৮ শতাংশ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্প সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে পরিবর্তন অভিমুখী একটি প্রকল্প যার রূপায়ণ চলেছে দ্রুততম গতিতে। শৌচালয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতায় সম্পূর্ণ সাফল্য পেতে এত দ্রুত কোনো দেশ কাজ করতে পারেনি। আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার এই সাফল্যের ফলে ভারতে অপুষ্টি ও সুষম আহার গ্রহণ করার প্রশ্নে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। একই সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্ধন যোজনা'র যৌথ সাফল্য ভারতকে অপুষ্টিমুক্ত দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক সার্থক পদক্ষেপ। এতে কোনও সন্দেহ নেই।

(লেখক IAS এবং নীতি আয়োগের CEO)

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Phone : 2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street, Block D-2
1st Floor
Kolkata - 700 001

।। একটি আবেদন ।।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং গৃহী কার্যকর্তা, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকার্য বিস্তারলাভ করেছে, তাঁদের স্মরণে '**ওদের আমরা ভুলিনি**' শীর্ষক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। সেই মহাপ্রাণদের যাঁরা সান্নিধ্যলাভ করেছেন তাদের অনুভব-কথন লিখে স্বস্তিকা পত্রিকার ঠিকানায় আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

রোহিঙ্গারা যেন ভারতে অনুপ্রবেশ না করতে পারে

ভারতের সংবিধান রচনাকারীদের কর্ণধার খ্যাতনামা গবেষক ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছেন, 'মুসলমানরা কেবল সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সংখ্যালঘু করতেই চেষ্টা চালাতে থাকেন না, তারা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকারও কমাতে থাকে ('the muslims are not only seeking to reduce the Hindu majority to a minority but they are also cutting into the political rights of the other minorities.'–Dr. B.R. Ambedkar, Writings and speeches, Vol. 8, p. 264). ড. আম্বেদকরের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা দেখা যাচ্ছে 'List of Muslim Majority Countries', Google Search থেকে। (Wikipedia Free Eneyclopedia.)

৪টি দেশে তারা সংখ্যালঘুদের হ্রাস করে করে শতকরা ১০০ জনকেই মুসলমান করেছেন, ৫টি দেশে তারা সংখ্যালঘুদের হ্রাস করে করে শতকরা ৯৯ জনকেই মুসলমান করেছেন, ২৫টি দেশে তারা সংখ্যালঘুদের হ্রাস করে করে শতকরা ৯০ থেকে ৯৯ জনকে মুসলমান করেছেন। বাংলায় মুসলমান সমাজ ছিল না। ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধরা। ১২০৪ সালে বক্তিয়ার খিলজির দ্বারা মুসলমান রাজত্ব শুরু। ধর্মান্তরকরণ দ্বারা হিন্দু-বৌদ্ধদের ১৮৭২ সালের মধ্যে তারা ১৫টি জেলায় সংখ্যালঘু করে ফেলে। তখন মোট ৩১টি জেলা ছিল। এ সব ১৮৭২ সালের জনগণনা থেকে জানা যায়। এখন ওই ১৫টি জেলা ভারতে নেই। ১৯৪৭ সালে ওই জেলাগুলি অধিকার করে তারা মুসলমান রাষ্ট্র পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং হিন্দুরা পূর্বপাকিস্তানে থাকতে না পেরে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৫ শতাংশ, এমএলএ ছিলেন ৫ জন। ২০১১ সালে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে এখন হয়েছে ৩০ শতাংশ (মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে)। ৫ জন এমএলএ থেকে বেড়ে হয়েছে ২০১১ সালে ৬০ জন। এখন রোহিঙ্গা মুসলমানরা ঢুকতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনবিন্যাসের পরিবর্তন দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। যেভাবে ১৯৪৭ সালে বাংলার ১৫টি জেলা বিদেশ হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির পরিণতিও একইরকম হবে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরুরা যখন সংখ্যালঘু হবে তখন উদ্বাস্তু হয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে? একটা প্রশ্ন : ইসলামে ভ্রাতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু মুসলমানরা ৫০টি মুসলমান রাষ্ট্রে আশ্রয় না নিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে? তাদের উদ্দেশ্য কী?

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম।

দুঃখের উৎসব মহরমে কেন শুভেচ্ছা?

বড়পূজা সমাপন হলো সঙ্গে সঙ্গে মহরমও পালিত হলো অর্থাৎ 'বিজয়া ও তাজিয়া একই দিনে হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু কোনো কাজিয়া হয়নি।' খুবই সুখের কথা যে এবার তাহলে মনে হচ্ছে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।

সমাপন হওয়া বিজয়া ও তাজিয়া উপলক্ষে রাজ্য সরকার ও রাজ্যসরকার পোষিত বিভিন্ন ক্লাব সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সংবাদপত্রে এই কথাটা দেখে চোখ বিদ্রোহ করে উঠল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যদি কোনো সঠিক জ্ঞানী ব্যক্তি সংবাদপত্র মারফত জানান কৃতজ্ঞ থাকব। মহরম হচ্ছে ইসলামিক ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস। কারবালার প্রান্তরে মুসলমানদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধ হয় তাতে বহু মুসলমানের সঙ্গে হাসান হুসেন

নামে দুই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মৃত্যু হয়। সেই উপলক্ষে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে এই দুঃখের উৎসবটি মহাসমারোহে পালিত হয়। শোভাযাত্রায় সজ্জিত থাকে তাজিয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ব্যক্তি মিছিল করে চলে হাসান হুসেন বলতে বলতে।

প্রশ্নটা এখানেই। কোনো দুঃখের ঘটনায় ওইরূপ শোভাযাত্রার অর্থটা কী? কেনই বা ওই ভাবে করা হয়? হিন্দুরা যেমন তাদের বাবা মারা যাবার পর বছরের ওই দিনটি দুঃখের সঙ্গে অতিবাহিত করে।

আর একটি কথা, রাজ্য সরকার ও রাজ্যসরকারের অনুগৃহীত ক্লাবগুলি মহরম উপলক্ষে মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানায়। তাহলে কী বুঝতে হবে তারা মহরমের দিনে যে দুঃখের ঘটনা ঘটেছিল তার অর্থ ঠিক জানে না? আর প্রশ্ন, কেন এই সুসজ্জিত শোভাযাত্রা কেনই বা তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয় অর্বাচীনের মতো। এ সম্পর্কে আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

বাংলার বাঘ

দেবব্রত চৌধুরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাংলার বাঘ বলে উল্লেখ করেছেন— (স্বস্তিকা, ২১.৮.১৭, পৃ. ১০)। 'বাংলার বাঘ' বলতে আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝে থাকি। বাংলার লাট লর্ড লিটন শর্তসাপেক্ষে নতুন টার্মে স্যার আশুতোষকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই শর্তাধীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ২৬.৩.১৯২৪ তারিখের দীর্ঘ পত্রের উপসংহারে লর্ড লিটনকে লিখেছিলেন, "...I decline the insulting offer you

have made to me." ওই সময়ে দেশবাসী তাঁকে 'Bengal Tiger'— 'বাংলার বাঘ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

জাতীয় পুনর্নির্মাণ বাহিনী

গত ২০০১ সালে জাতীয় যুব নীতি প্রণয়ন তথা যুব কার্যক্রমকে সশক্তকরণের লক্ষ্যে যুবকদের উদ্দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যুবকদের দুই বছর সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সময়ে যুব মন্ত্রকের অধীনে স্বশাসিত সংস্থা নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের মাধ্যমে একটি প্রোজেক্ট তৈরি হয়েছিল যার নাম ছিল National Reconstruction Crops (NRC) বা জাতীয় পুনর্নির্মাণ বাহিনী। বহু যুবক সেই মূল্যবান উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের জীবন হতে ২ বৎসর উৎসর্গ করেছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে একজন। সেই সময় প্রতিমাসে সাম্মানিক ভাতা হিসাবে কিছু টাকা পাওয়া যেত। সরকারের সেই সময় উদ্দেশ্য ছিল pilot project-এর সময়সীমা পার হলে, 10th planning commission-এর মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করে ব্যাপক ভাবে সব কার্যক্রমে ঝাপিয়ে পড়বে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তা আজও লালফিতার ফাঁসে আটকে আছে। এক সময় যারা আমরা সমাজ হতে দারিদ্র্য দূর করার ও যুবকদের দিশা দেওয়ার শপথ নিয়ে মুখ্য ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছিলাম তারাই আজ দারিদ্র্য ও দিশাহীনতায় ভুগছি। এই সমস্যাটির আশু সমাধানের লক্ষে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—**করুণাময় চক্রবর্তী,**
হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

জিএসটি বিল ও রাজ্যের অপপ্রচার

জিএসটি বিল প্রথম উত্থাপন হয় ফ্রান্সের পার্লামেন্টে, এবং জানুয়ারি ১৯৯১ সালে Brian Mulroney প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম চালু হয়।

জিএসটি কী : আমাদের দেশে কোনো পণ্য যখন ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় প্রথমে তার উপর Central Excise Duty তারপর Service Tax, Additinal Customs duty, Surcharge এবং পণ্যটি যখন এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে যায় তখন আন্তঃরাজ্য পরিষেবা কর বা Octroi দিতে হয়। এই সমস্ত করগুলিকে একত্রিত করে যখন একটি মাত্র কর দিতে হবে, তারই নাম জিএসটি (গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স)।

জিএসটি একটি মানি বিল। আমরা জানি সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই অর্থ বিলের সংজ্ঞা (১১০ নং ধারা) উত্থাপন ও প্রণয়নের পদ্ধতি আছে (১০৯ নং ধারা)। প্রথমত অর্থবিল উত্থাপনের আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিতে হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া এটি উত্থাপন করা যায় না। বিলের তিনটি পাঠ হয়। প্রথম পাঠের পর এটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। এই সিলেক্ট কমিটিতে ৩০ জন প্রতিনিধি থাকেন। এই প্রতিনিধিরা শুধু শাসকদলেরই হন না বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও এই কমিটির সদস্য হন। তারপর এটিকে পর্যায় ক্রমে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভা বিলের Amendment-এর কথা বলতে পারেন, বা বিলের কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিলটি লোকসভায় আসে। স্পীকার এটি অর্থবিলের স্বীকৃতি দেন।

জিএসটি বিলের জন্য রাজ্যসভা কোনো Amendment এর কথা বলেননি। এবং কোনো যৌথ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়নি। রাজ্যসভায় ইউপিএ প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন এবং লোকসভাতেও ইউপিএ-র প্রতিনিধি এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৭ জন প্রতিনিধি আছেন। সর্বোপরি জিএসটি-এর রাজ্য অর্থমন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত কমিটির সভাপতি বর্তমানে আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিত মিত্র। এবং প্রকৃতপক্ষে এই বিলের প্রাক্তন সভাপতি আমাদের বিগত শাসকদলের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অসীম দাশগুপ্ত বর্তমান ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও বলেছেন এই বিলের প্রথম ধারণা তিনি অসীমবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছেন।

সুতরাং যেখানে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিরোধী দলগুলির সম্মতি না থাকলে জিএসটি অর্থবিলে পরিণত হোত না, সেখানে সর্বভারতীয় স্তরে সম্মতি দিয়ে বিল পাশ করানোর পর কোন কায়েমি স্বার্থে ইউপিএ প্রতিনিধিরা ও আমাদের রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধিরা বিরোধিতার রাজনীতি করে ভারতের সাধারণ মানুষকে ভুল পথে চালিত করছেন?

—**সৌরভ ব্যানার্জী,**
বেহালা, কলকাতা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

হিন্দু বাঙালির উপাধি

রবীন সেনগুপ্ত

উপাধির বৈচিত্র্যে বাঙালি জাতি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। প্রায় দুইশত উপাধি রয়েছে বর্তমানে— যেগুলি বাঙালিরা বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে কিছু উপাধি রয়েছে যেগুলি উত্তর ভারত থেকে আগত। যেমন পাণ্ডে, দেবশর্মা, তেওয়ারি, পণ্ডিত, মিশ্র, শাস্ত্রী ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় এগুলিকে আপনার করে নেওয়া হয়েছে। এই বহিরাগত উপাধিগুলি জাতিগত ভাবে সবাই ব্রাহ্মণ। এছাড়াও বাংলায় নিজস্ব ব্রাহ্মণ উপাধির মধ্যে রয়েছে মৈত্র, ঘটক, অধিকারী, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, চট্টরাজ, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঠাকুর, চক্রবর্তী, গোস্বামী, উপাধ্যায়, তর্করত্ন, সিদ্ধান্ত, আচার্য, ঘোষাল, ব্রহ্মচারী। দুবে, চৌবে, ত্রিবেদী— এই উপাধিগুলিও বহিরাগত ব্রাহ্মণদের। কুলীন ব্রাহ্মণদের উপাধি হলো— বাগচী, সান্যাল, লাহিড়ী, বটব্যাল ও ভাদুড়ী।

যেসব ব্রাহ্মণ পূর্বে গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা ও চিকিৎসা পেশায় যুক্ত ছিলেন— তাঁদের বলা হতো বৈদ্য ব্রাহ্মণ। বৈদ্য ব্রাহ্মণদের উপাধি— গুপ্ত, সেনগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, দাশগুপ্ত, কবিরাজ ধরগুপ্ত। রায়, মজুমদার ও সরকার— পাওয়া উপাধিগুলির মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক। এই তিনটি উপাধি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থরা ব্যবহার করে থাকেন।

ক্ষত্রিয় বাঙালির উপাধিগুলি হলো— সিংহ, রায়চৌধুরী, সামন্ত, ভুইঞা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের পূর্বনাম ছিল শ্রী বিনোদ ভুইঞা।

কায়স্থদের মধ্যে— বসু, মিত্র, গুহ এগুলি কুলীন কায়স্থর উপাধি। বেনেদের উপাধি হলো— সেন, মল্লিক, দত্ত, আঢ্য, ধর, বণিক, সওদাগর, চন্দ্র। মল্লিক অহিন্দুর উপাধিও হয়।

আরও বেশ কিছু বহুল ব্যবহৃত বাঙালির উপাধি হলো— সাহা, মণ্ডল, দাস, ঘোষ, পাল, ভৌমিক, রক্ষিত, জোয়ারদার, চাকলাদার, গোলাদার, তালুকদার, তরফদার, দফাদার, শিকদার, পোদ্দার, সাহানা, কর্মকার, কর, ভদ্র, দেব, দেবনাথ, বর্মন, বিশ্বাস, বসাক, হালদার, বেরা, দাশমুন্সি, আইচ, হাজারি, রজক, বৈদ্য, নস্কর, মান্না, বড়াল, পাঠক, পাত্র, মহাপাত্র, প্রামাণিক, গুহঠাকুরতা, হাজরা, নিয়োগী, আগমবাগীশ, নন্দী, কুণ্ডু, দে, ঘোষ দস্তিদার। এর মধ্যে মণ্ডলরা— মাহিষ্য, সদগোপ, সৎচাষা, চাষদ্রি ও পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়— এই পাঁচ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। মণ্ডল উপাধির জনসংখ্যা বাংলায় সর্বাধিক।

বাঙালির স্বল্প ব্যবহৃত উপাধিগুলির মধ্যে রয়েছে— গনাই, মিধ্যা, দলুই, বরকন্দাজ, করণ, রুজ, ধাড়সা, লোহ, শাণ্ডিল্য, অগস্তি, পাইন, গাইন, হোড়, বেলেল, দাম, মৌলিক, গুছাইত, কোঙার, ভাস্কর, সোনার, সর্বজ্ঞ, শ্রীমানি, পান, চাকি, শিকারি, ওঝা, ঝা, দাঁ, কীর্তনীয়া, পালিত, ঘাটি, হাটি, সোম, মঙ্গল, মহানালবিশ, খাসনবিশ ইত্যাদি।

হালদার উপাধিটি মুখ্যত জেলেদের হয়। কিন্তু কলকাতার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পূজার হাল ধরার জন্য পুরোহিতদের হালদার উপাধি দেওয়া হয়। তাদের বংশধররা হালদার ব্রাহ্মণ রূপে বাংলায় ছড়িয়ে গেছে।

বাঙালি বনবাসী সমাজের কিছু উপাধি হলো— মুর্মু, কিস্কু, ওঁরাও, লোধ, সর্দার, বেইজ ইত্যাদি।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সেনাদের একাংশের পরে মাল উপাধি হয়ে যায়। খান উপাধিটি মুসলমান আমলে কিছু হিন্দুকে প্রদান করা হয়েছিল। আরও কিছু বাঙালির উপাধি যেগুলি এতক্ষণ আলোচিত হয়নি সেগুলি হলো— ধারা, বড়ুয়া (অসম থেকে আগত), সাধুখাঁ, পাঁজা, কোটাল, স্বর্ণকার, পুততুণ্ডু, সূত্রধর, দাম, দিন্দা, বরাট, দাসমুন্সি, বৈরাগী, ভক্ত, শূর, ধীবর, কানুনগো, সরখেল, রুদ্র, বারিক, পাকড়াশি, সাঁতরা, শীল, দেবসেন, গিরি, হালুই, দালাল, বাগদী, মালাকার, ধাক্স, ঘড়াই, পুরকায়স্থ, মাঝি, সরখেল, সাউ, খাস্তগীর, মুস্তাফি, মুন্সী, রথ (ওড়িশা থেকে আগত), বাগ, মালিয়া (বা মালা)।

আরও কিছু উপাধি রয়েছে বাঙালিদের মধ্যে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞদের পত্র মারফত এই পত্রিকায় জানানোর আবেদন করছি। ■

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

সংস্কৃত শিক্ষাদানে মধুসূদন চতুষ্পাঠী

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

মধ্যযুগে শিক্ষাবিস্তারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল ব্রাহ্মণদের পরিচালিত চতুষ্পাঠী, যা টোল বলে পরিচিত। দশ-বারোখানি গ্রামের মধ্যে কোনো এক ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে কোনো রাজা, জমিদার বা বিত্তবান ব্যক্তির উদ্যোগে টোল প্রতিষ্ঠিত হতো। সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ছাত্র- ছাত্রীদের সংস্কৃত বিষয়ে পাঠদান করতেন। তিনি এলাকায় টুলো পণ্ডিত নামে পরিচিত হতেন। এই টুলো পণ্ডিতকে দুই-পাঁচ বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি বা সামান্য বৃত্তি দেওয়া হতো। কোনো কোনো পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে ছাত্রও থাকতো। শিক্ষার্থী গুরু ও গুরুপত্নীকে পিতা মাতার মতো সেবাযত্ন ও শ্রদ্ধাভক্তি করতো।

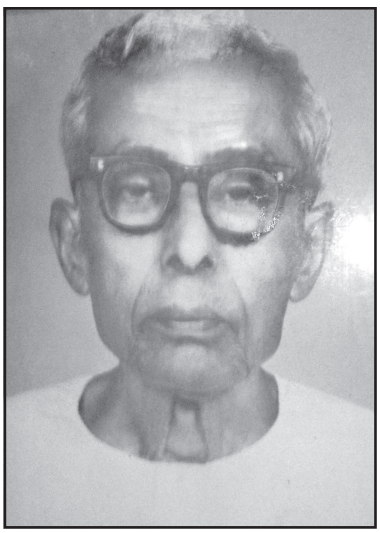

স্বর্গীয় সীতাকান্ত আচার্য

নবদ্বীপ, রামকেলি, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হালিশহর, ভাটপাড়া, চন্দনপাড়া, ভদ্রেশ্বর, আন্দুল ও বালী চতুষ্পাঠী প্রসিদ্ধ ছিল। দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসী থেকে দলে দলে ছাত্ররা বর্ধমান চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়তে আসতো। এদের মধ্যে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। নব্যন্যায় ও স্মৃতিচর্চার কেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপের বিশেষ পরিচিতি ছিল। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম প্রমুখ দেশের বিভিন্ন স্থানে নৈয়ায়িক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলার চতুষ্পাঠীগুলিতে জ্যোতিষ, ন্যায়, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ ছাড়াও ভারবি, মাঘ, কালিদাস প্রমুখের কাব্য পড়ানো হতো।

রাঢ়দেশের হটী বিদ্যালঙ্কার ও হটু বিদ্যালঙ্কার, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী, কোটালিপাড়ার প্রিয়ম্বদা দেবী ও বৈজয়ন্তী দেবী প্রমুখ মহিলা সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ সোপানে উন্নীত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে হটী বিদ্যালঙ্কার সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাঢ়দেশের এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং বাল্যকালেই বিধবা হন। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিত সমাজ তাঁকে বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হটু বিদ্যালঙ্কারের আসল নাম ছিল রূপমঞ্জুরী। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে ষোল-সতেরো বছর বয়সে তাঁকে এক ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে পড়তে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে তিনি ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অনেক বড়ো বড়ো কবিরাজ তাঁর কাছে চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং পুরুষের মতো মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় শিখা রাখতেন।

সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। মালদহ জেলার রামকেলি, কলিগ্রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচোল, আড়াইডাঙা, নঘরিয়া এবং মালদহ শহরের কালীতলা, ফুলবাড়ি, কাশিগ্রাম, কতুবপুরে চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। নবদ্বীপ থেকে বাসুদেব সার্বভৌম এসে রামকেলি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়াতেন। সেখানে তাঁর কাছে রূপ সনাতন সংস্কৃত পড়তেন। মালদহ জেলার টোলগুলিকে নিয়ে সংস্কৃত উৎসবের আয়োজন করা হতো। এই উৎসব মালদহ শহরের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ও মালদহ বি.টি. কলেজে অনুষ্ঠিত হতো। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহীপাল দিঘির নীলকুঠির দক্ষিণ দিকে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানে গোলকনাথ শর্মা এবং তাঁর ভাই কালীনাথ শর্মা সংস্কৃত পড়াতেন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ শহরে একটি চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার চাভোট গ্রামের মধুসূদন আচার্য একজন সংস্কৃতজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে চাভোটে তাঁর বাড়িতে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। তাঁর ছেলে সীতাকান্ত আচার্যকে (১৯০৬-১৯৯০) দশ-এগারো বছর বয়সে বারাণসীতে সংস্কৃত পড়তে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে তিনি স্বর্ণপদক নিয়ে কাব্যব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং পরে বিদ্যাবিনোদ উপাধিতেও ভূষিত হন।

রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগ দেন। বিদ্যালয়ে তিনি সেকেন্ড পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি ওই বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি মহাবিদ্যালয়ে কিছুদিন সংস্কৃত অনার্সে ব্যাকরণ পড়ান। তাঁর উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের থানার সন্নিকটে হিন্দি স্কুলের বিপরীত দিকে ১৯৩৬ সালে মধুসূদন চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাঁর বাবা মধুসূদন আচার্যের নামে মধুসূদন চতুষ্পাঠী নাম দেওয়া হয়। সেখানে কুড়ি ফুট দৈর্ঘ্যের পনেরো ফুট প্রস্থের চাটাইয়ের বেড়া ও টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ঘর তৈরি করা হয়। ওই ঘরের পূর্ব দিকে একটি এবং দক্ষিণ দিকে আরেকটি দরজা ছিল। বেড়ার উপর চুনকাম ছিল এবং মেঝেও পাকা ছিল। ওই ঘরের দুটি আলমারিতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ

থাকতো, যা ছাত্রছাত্রীদের উপকারে লাগতো। যেখানে প্রথম দিকে মেঝের উপরে শতরঞ্চি বিছিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বসতেন। পরে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘরের পেছনে একটি টিনের ঘরে তিনি থাকতেন। ১৯৭০ সালে টোলের পুরনো ঘর ভেঙে সেখানে পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়। তখন থেকে ওই ঘরের বারান্দায় টোলের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হতো। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে কাব্য ও ব্যাকরণ তীর্থের পাঠ্যসূচির কুমারসম্ভব, রঘুবংশম্, শিশুপালবধম্, ভট্টিকাব্যম, নৈষচরিতম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, প্রতিমা নাটকম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্, মৃচ্ছকটিকম্, বেণীসংহারম্, সাহিত্যদর্পণম্, ছন্দমঞ্জুরী, লঘু সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তেন।

সীতাকান্ত আচার্য খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। মাথায় শিখা রাখতেন এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা নিতেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি থাকতো। কথাবার্তা ধীর স্থির হলেও গুরুগম্ভীর মেজাজের মানুষ ছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় টোলে সংস্কৃত পড়াতেন। রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ে সার্কেল পরিদর্শকের অধীনে টোলের পরীক্ষা হতো। তখন কালিয়াগঞ্জ, মালদহ, হরিশ্চন্দ্রপুরের বহু পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে অসতেন। সেই সময় তাঁরা পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। টোলে প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হতো। পুজোর নিমন্ত্রণপত্র সংস্কৃত ভাষায় ছাপানো হতো।

তাঁর কাছে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহনলাল ঝাঁওয়ার, সুধীর চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত ঝা, আরতি দেবনাথ, পবিত্র চক্রবর্তী, বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা, মাধুরী চৌধুরী, কল্যাণী রায় প্রমুখ সংস্কৃত পড়তেন। এঁরা কেউ কাব্যতীর্থ, কেউ ব্যাকরণতীর্থ, কেউ কাব্যব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজে বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। মাধুরী চৌধুরী সীতাকান্ত আচার্যের আপন শালিকা। তিনি জামাইবাবুকে দেখে সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন এবং পরে কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও সাহিত্য ভারতী উপাধিতে ভূষিত হন। সীতাকান্ত আচার্যের মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিন সোহনলাল ঝাওয়ারকে টোলে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পঞ্চানন চক্রবর্তী, অর্ধ রায়চৌধুরী, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। দীর্ঘদিন থেকে পঞ্চানন চক্রবর্তী ওই কমিটির প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি স্মৃতি ও ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং ঢাকার সাভার মনোমোহন ঔষধালয় তাঁকে কবিরঞ্জন আখ্যা দেয়। মোহনবাটী হাইস্কুল, সুভাষগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কাছে টোলের অনেক ছাত্রও পড়াশুনা করেন। রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুরে তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। বহু জায়গায় সংবর্ধিত হন। একশো সাত বছর বয়সের এই মানুষটি আজও মানুষজনকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন।

আরতি দেবনাথ রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত অর্নাস নিয়ে স্নাতক হন। মধুসূদন চতুষ্পাঠী থেকে কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। মধুসূদন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতমশাই সীতাকান্ত আচার্যের তিনি খুব প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তাঁকে মধুসূদন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করা সীতাকান্ত আচার্যের প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৯১ সালে আরতি দেবনাথকে এই টোলের অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি কিছুদিন ওই বাড়ির বারান্দায় পড়ান।

তারপর পরিচালন সমিতি, পৌরপতি ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের পরামর্শে ওই টোল সুদর্শনপুরের আরতি দেবনাথের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সেখান থেকে মঞ্জুলা চক্রবর্তী, পরিমল চক্রবর্তী ও অরূপ ভট্টাচার্য, বিজয় চক্রবর্তী, আশিস চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তি কাব্যতীর্থ উপাধি অর্জন করেন। আরও অনেকে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিয়ে উপাধি পরীক্ষায় বসেননি। আরতি দেবনাথ টোলে পাঠদানের জন্য প্রথম দিকে ছ'শো টাকা এবং পরে পাঁচ হাজার সাতশো টাকা সাম্মানিক ভাতা হিসেবে পেতেন।

অনার্সের মতো টোলের ছাত্রছাত্রীদেরও আটশো নম্বরের পরীক্ষায় বসতে হয়। টোলে তাঁদের লেখাপড়ার জন্য কোনো বেতন লাগতো না। তবে পরীক্ষার ফি বাবদ সামান্য টাকা দিতে হতো। মধুসূদন চতুষ্পাঠী থেকে বহু ছাত্রছাত্রী কাব্যব্যাকরণতীর্থের উপাধি নিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কেউ কেউ পূজার্চনায়, গীতাপাঠে সুখ্যাতি অর্জন করেন। মাধ্যমিকে সংস্কৃত ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ার পর থেকে টোলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। গত দশ বছর মধুসূদন চতুষ্পাঠীর কোনো পরীক্ষা হয়নি। তার ফলে এই টোলটি অস্তিত্বের চরম সংকটে পড়েছে।

রায়গঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রজেক্টের বিষয় নির্বাচিত করা হলে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসবে এবং সংস্কৃত পড়ার জন্য অনেক ছাত্রছাত্রীর আগমন ঘটবে। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় স্বগৌরবে ফিরবে, জেলা উপকৃত হবে।

তথ্যপঞ্জী :

(১) বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, ড. অতুল সুর, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১৬-২১৮। (২) পুরোনো দিনের গ্রামবাংলা, শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩-১১৪। (৩) মধুপর্ণী, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), পৃ. ৭০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

(১) সাক্ষাৎকার : সুনন্দা চক্রবর্তী, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২রা আগস্ট, ২০১৭। (২) পঞ্চানন চক্রবর্তী ও পরিমল চক্রবর্তী, বন্দর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২ আগস্ট, ২০১৭। (৩) আরতি দেবনাথ, অধ্যাপিকা, মধুসূদন চতুষ্পাঠী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২ আগস্ট, ২০১৭। (৪) লক্ষ্মীকান্ত ঝা, কলেজপাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২ আগস্ট, ২০১৭। (৫) মাধুরী চৌধুরী, বন্দর রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ৪ আগস্ট, ২০১৭।■

ভারতীয় সঙ্গীতের ‘সরস্বতী’ গিরিজা দেবীর জীবনাবসান

সুতপা বসাক ভড়

‘বাবুল মোরা নৈহর ছুটো হি যায়’— গাইতে গাইতে গিরিজা দেবীর জীবনের নৌকা ‘ছুটে’ গেল জীবনের ৮৮তম হেমন্তে। তিনি বলতেন, বিয়ের কনে বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে যায় আর চারজন কাহার তার পালকি নিয়ে যায়, অপরদিকে জীবনের অন্তিম পর্বেও চারজন আমাদের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায়। এই সংসার ছেড়ে যখন আমরা চলে যাই, তখন অন্যেরা কাঁদে। গানের কী অপূর্ব ব্যাখ্যা! তাঁর কাছে গান কেবলমাত্র সুর, তাল, লয়ের খেলা নয়, ভাবের খেলাও বটে! সঙ্গীতের এই ভাবসমুদ্রে তিনি তাঁর শ্রোতাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। শুভ্রবসনা গিরিজা দেবী যখন গাইতেন— মনে হতো সাক্ষাৎ মা সরস্বতী কৃপা বর্ষণ করছেন। নাকের হিরের নাকছাবিটিও ঠিকরে উঠত সঙ্গীতের ঝংকারে। অপূর্ব নিপুণতা ছিল তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনে। শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করে দিতেন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুরসমুদ্রে। নিজ পরিচিত মহলে তিনি আপ্পাজী নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি যুগের অন্ত হয়ে গেল। এই যুগে ছিল বারাণসীর বিখ্যাত চৌমুখী গায়নশৈলী, আর ছিল ধামার, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, তরানা, টপ্পা, হোড়ী, কজরী, চৈতী ইত্যাদি।

গিরিজা দেবীর জীবন কেটেছে আভিজাত্যের মধ্যে। বাবা ছিলেন জমিদার এবং সঙ্গীতের অনুরাগী। বাল্যকালে বাবার কাছেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল গিরিজা দেবীর মধ্যে যেন রানি লক্ষ্মীবাইয়ের প্রভাব থাকে। সেজন্য মেয়েকে তিনি তির-ধনুক এবং তলোয়ার চালানো শিখিয়েছিলেন। শিখিয়ে ছিলেন অশ্বারোহণ। বেশ কয়েকবার বাইরে মারপিট করেও বাড়ি ঢুকেছেন, কিন্তু তাঁর বাবা মেয়েকে তখনও ঘরের ভেতর বন্দি করে রাখেননি, তাকে তিনি নির্ভীক হতে শিখিয়েছিলেন। বাবার ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল গিরিজা দেবীর চরিত্রে। স্বাভাবিকভাবেই বাবার থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ জন্মায় তাঁর মধ্যে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পণ্ডিত সরযূপ্রসাদের কাছে সঙ্গীতের

প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের গান শেখা ভাল চোখে দেখা হতো না। এ ব্যাপারে কেউ গিরিজা দেবীর বাবাকে কিছু বললে, তিনি বলতেন— হ্যাঁ, আমার মেয়ে গান গায়— এটা কি অন্যায়? আমার মেয়ের যদি ইচ্ছা হয়, তবে সে অবশ্যই শিখবে।

ছোটবেলায় গিরিজাদেবী একটি সিনেমাতেও কাজ করেছিলেন। পণ্ডিত সরযূপ্রসাদ জানতে পেরে রুষ্ট হন। এই ভাবে তাঁর জীবন ধীরে ধীরে কেবলমাত্র সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছিল। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়— তারপর কন্যাসন্তানের মা। ওই সময় তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু, যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন পণ্ডিত শ্রীচন্দ্র মিশ্রের কাছে গেলেন তাঁর অসম্পূর্ণ সঙ্গীত সাধনা সম্পূর্ণ করতে। এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সবসময় তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন।

একবার পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর গিরিজা দেবীর গান শোনেন। তিনি

অঙ্গনা

১৯৪৯ সালে আকাশবাণীতে তাঁর গানের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে গিরিজা দেবীকে ৯০ টাকা এবং ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট দেওয়া হয়, যা ওই সময় বড় বড় সঙ্গীতশিল্পী— রসুলন বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে দেওয়া হতো। এরপর ১৯৫১ সালে বিহারের আরাতে একটি অনুষ্ঠানে ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গান গাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি পৌঁছাতে পারেননি। আয়োজকদের অনুরোধে গিরিজা দেবী গাইলেন— রাগ দেশি। তখনকার দিনে কম করে আড়াই হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিল গিরিজা দেবীর সঙ্গীত নিবেদন।

একবার দিল্লীতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর গান শুনে রাধাকৃষ্ণন তাঁকে আরও গান শোনাতে অনুরোধ করেন এবং এরপর তিনি আরও ৪০ মিনিট ধরে গান শোনান। ওই অনুষ্ঠান গিরিজা দেবীকে সর্বভারতীয় পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। এরপর দেশে-বিদেশে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের পরিবেশন-প্রচার-প্রসার করতে থাকেন। কলকাতায় তিনি বসবাস করেছেন। সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে গান শিখিয়েছেন। গত বছর দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন। ৮৮ বছর বয়সেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। কাজের মধ্যে থাকাই ছিল তাঁর সাধনা। অবশেষে ‘নৈহর ছুটো হি যায়’— মরলোক ছেড়ে অমৃতলোকের উদ্দেশে হয় তাঁর অন্তিম যাত্রা। ■

গণমাধ্যমের লাগামহীন স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

কে. এন. মণ্ডল

'ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র'— প্রচারার্থে এ ধরনের তকমায় অধিকাংশ ভারতবাসীর বুকের ছাতি স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এ দাবির সারবত্তা খুঁজে পেতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করতে হবে। কারণ, সাধারণ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো চরিত্রই পরিস্ফুট নয়। 'গণ'-শব্দটির অর্থ যদি হয় 'জনসাধারণ' —তাহলে 'গণতন্ত্র' হচ্ছে জনসাধারণের দ্বারা মানুষের স্বার্থে পরিচালিত সরকার। আর, এই সরকার গঠনের প্রাথমিক শর্ত, 'অবাধ নির্বাচন'। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কী সাক্ষ্য বহন করে এই অবাধ নির্বাচনের ব্যাপারে?

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের গত বিধানসভার (২০১৬) নির্বাচনপূর্ব একটি ঘটনা উল্লেখ্য। শাসকদলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক এবিপি আনন্দে এক সাক্ষাৎকারে বলেন— 'ভোট হয় না, ভোট করাতে হয়।' অর্থাৎ নানা কৌশলে ভোটদাতাদের মতামত প্রভাবিত করে দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে হয়। পদ্ধতি হিসাবে অবাঞ্ছিতদের (বিরোধীদের) কারুর কারুর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শন, তাতে কাজ না হলে রাস্তায় বোমা ফাটানো। অসফল হলে পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা ভোটযন্ত্র করায়ত্ত করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে এই পদ্ধতি সর্বত্র গ্রহণ করা হয় না। যেখানে হার-জিত অল্প ব্যবধানের উপর নির্ভর করে— অঙ্ক কষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে সমস্ত কেন্দ্রে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অতীতে বামফ্রন্টের ম্যানেজাররা এই ব্যবস্থার প্রবর্তক হলেও, বর্তমান শাসক দল খোলাখুলি এতে হাত পাকিয়েছে। স্মরণে থাকবে— গত বিধানসভা ভোটের সময় কোচবিহারের একটি বুথে কোনো এক সরলমতি পোলিং অফিসার শাসকদলের প্রদর্শিত পথে ভোট পরিচালনায় আপত্তি করলে ওখানের এক নেতা ওই পোলিং অফিসারকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করে 'বুথের বাইরে দেখে নেব' হুমকির দ্বারা। অথচ নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয় ওই খবর প্রকাশ্যে আসা সত্ত্বেও। ওই নেতা বর্তমানে মন্ত্রীসভায় দায়িত্বশীল পদ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কিরণ বিকিরণ করে যাচ্ছেন— আর এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র, তার এক ঝলক।

লক্ষণীয়, জনমতকে পদদলিত করে খর্বিত রায় দানের মাধ্যমেও ২/৪ জন বিরোধী প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পরেও বিজয় নিরঙ্কুশ করতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটি হুমকি-ধমকিতে ব্যর্থ হলে, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে চাপ সৃষ্টি, মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের দল ভাঙিয়ে সরকারি দলে শামিল করে। আবার দলত্যাগীরা উন্নয়নের স্বপ্ন ফেরি করে তাদের অনৈতিক কাজের সাফাই গায়। এই সর্বগ্রাসী মনোভাব গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সহায়ক কিনা এ প্রশ্ন করার দায় কার? মানুষের রায়কে অগ্রাহ্য করে নির্লজ্জতার মাথা খেয়ে কোনো কোনো দলীয় ওজনদার নেতাকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে শোনা যায়— কবে কোন পৌরসভা বা জেলা পরিষদ দখল করা হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ অবক্ষয় আটকানোর কী কোনও ব্যবস্থা নেই? যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র নিয়ে কেন এই বাগাড়ম্বর? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নির্বাচন কমিশন— এমনকী বিচার ব্যবস্থাও এ সকল ঘটনায় খুবই শিথিল মনোভাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে বেশরম দলত্যাগীরা জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নবলব্ধ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) ক্ষমতার অলিন্দে সদর্পে বিচরণ করে নিজেদেরকে 'সততার প্রতীক' ন্যূনপক্ষে সততার পতাকাবাহী ঘোষণার মাধ্যমে ওদের বিরুদ্ধে দৃশ্যত দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও। আর এটা সম্ভব হচ্ছে অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অশিক্ষা, দারিদ্র এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। রুটিন মাফিক ভোট হলেই গণতন্ত্র হয় না, গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের মাধ্যমে। এখানে সামন্ততান্ত্রিক হালচাল একেবারেই বেমানান। রাজতন্ত্রের ন্যায় অনন্য সাধারণ চলন বলন, ক্ষমতার আস্ফালন ও অপব্যবহার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অমর্যাদা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী, অথচ এরকম ঘটনার নিত্য সাক্ষী আমরা, তথাপি ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র।

সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলের সদর্থক ভূমিকা আছে। সবার আগে জন সচেতনতার দায়িত্ব নিতে হবে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ এবং প্রহরী সংবাদমাধ্যমকে। তবে সংবাদমাধ্যমকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও জনমুখী হতে হবে। হুমকি-ধমকি, বিজ্ঞাপনের লোভে বা অন্য কোনো প্রলোভনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেওয়া সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের সহায়ক হতে পারে না। নির্ভেজাল খবর পরিবেশন যেমন সাংবাদিকদের কাজ তেমনি জনমুখী তারতম্যহীন বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা নেবে পত্রিকা গ্রুপ। বিরুদ্ধ মতাদর্শ বা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ করা কিন্তু রাজনৈতিকদের কাজ, সংবাদপত্রের নয়। ইদানীংকালে কোনো একটি বিশেষ পত্রিকা গ্রুপের সম্পাদকীয় পড়লে দেখা যায়, তাদের কাগজের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে জনসমক্ষে হেয় করা। কোনো রাজনৈতিক নেতার বালখিল্যতা বা চপলতা— তা যদি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ওই ধরনের খবরের প্রচার ও প্রসার, সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং তা প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে জনসমক্ষে হেয় করার শামিল। প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বকে খর্ব করলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে দেশের উপর। সরকারের জনমুখী প্রকল্প সমূহ যেমন— স্বচ্ছতা অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সকলের জন্য গৃহ প্রকল্প, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, গরিব মহিলাদের জন্য রান্নার গ্যাস বিতরণ, সকলের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি বিষয়ও প্রচার পায় না, বা জন-সচেতনতা সৃষ্টি করে প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণে জনমত গঠনে কোনও ভূমিকা নেই এই পত্রিকাগুলির। অথচ, তাদের নেতিবাচক ভূমিকা দেখা যায় প্রকল্পগুলির খুঁত প্রচারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নোট বাতিলের পরে মানুষের সাময়িক অসুবিধাকে উসকে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনে ইন্ধন জোগানো, জিএসটি চালুর পরে এর প্রাথমিক অসুবিধাগুলিকে বিজ্ঞাপিত করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি, তিন তালাকের ব্যাপারে মোদী সরকারের সদর্থক ভূমিকাকে মেরুকরণের চেষ্টা বলে অভিধা দেওয়া ইত্যাদি কোনও দায়িত্বশীল বহুল প্রচারিত খবর কাগজের ভূমিকা হওয়া নিন্দনীয়। ভারতবর্ষের মতো ১৩০ কোটি মানুষের একটি উন্নয়নশীল দেশে অশিক্ষা, অপুষ্টির মতো মানবিক সমস্যাকে সামাল দিতে জাতীয় ঐকমত্য তথা সচেতনতা সৃষ্টির কাজে সংবাদমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। তা না করে, মহৎ উদ্দেশ্যে নেওয়া সরকারি প্রকল্পকে কটাক্ষ, এমনকী নরেন্দ্র মোদীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান ব্যর্থ ধরনের সম্পাদকীয় লেখা হয় একটি বিশেষ পত্রিকায়। অথচ রেলের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেখানেই থুথু ফেলার মতো ঘটনাকে ধিক্কার জানানোর কোনও কলাম লেখা হয় না। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণ, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ, দেশ ব্যাপী নাশকতা, মৌলবাদের মতো সমস্যার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার কাজে সক্রিয় না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচক ওই খবর পত্রগ্রুপ। এরাই কন্যাশ্রীতে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে লাগাতার ঢাক পেটাচ্ছে রাজ্য সরকারের অথচ, সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে পিছিয়ে আছে। এর কারণ কিন্তু সংবাদমাধ্যম এবং গণ- সংগঠনগুলির যথাযথ সচেতনতা তৈরিতে ব্যর্থতা। সংবাদমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট খবর পরিবেশনের ফলেই জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি এবং অনাস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রহরীর ভাবমূর্তি।

সফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভারতের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের নেতবিাচক ভূমিকা। দেশ বিরোধী কার্যকলাপ, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, বিভেদের রাজনীতি এ সমস্ত বিষয় গুরুত্ব না দিয়ে, ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে জাতিদাঙ্গা হিসেবে দেখিয়ে খবর সম্প্রচার, এমনকী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচারের আলোয় এনে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান— এসবই গণতান্ত্রিক অধিকারের ঢাল হিসেবে করে করা হলেও, আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রশস্ত হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবাহনের রাস্তা।

উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে ভারতের অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐক্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়াসই হওয়া উচিত দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের সার্বিক ভূমিকা। অথচ, কালোটাকার কারবারিদের আঘাত ও দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহসী পদক্ষেপ বিমুদ্রীকরণ এবং কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য জিএসটি চালুর মতো পদক্ষেপের ধারাবাহিক বিরোধিতা করে যাচ্ছে এক সংবাদপত্র। দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ এই ধরনের প্রচারকে কায়েমি স্বার্থ এবং দুর্নীতিবাজদের স্বার্থে করা হচ্ছে বুঝেই এ ধরনের প্রচারকে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে। আমরা জানি যে কোনো ধরনের সংস্কার তা জমিদারি প্রথা বিলোপই হোক বা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ— তা কখনোই মসৃণ হয়নি, প্রতিরোধ প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে কায়েমি স্বার্থের দ্বারা। আর এটাই স্বাভাবিক। যারা কালো টাকার মালিক বা যে ব্যবসায়ীরা কর ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত তারা এ ধরনের সংস্কার সমর্থন করবে— তা চিন্তা করাই বাতুলতা। ইতিমধ্যেই জিএসটি চালুর ফলে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। যে সমস্ত কালোটাকা ব্যাঙ্কিং চ্যানেলে এসেছে তার উৎস সন্ধানের কাজ চলছে জালনোটের উপর আঘাতের ফলে উগ্রপন্থা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। নিবন্ধকার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে CBS (Core Banking Solution) চালুর প্রথম কয়েকমাস ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহককুলের কতই না অসুবিধায় পড়তে হয়েছে— অথচ তার কী সুফল হয়েছে তার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও সাফাইয়ের দরকার নেই। কোনও প্রকল্প চালুর সময় থেকেই ত্রুটিমুক্ত থাকে না, কারণ চাপে না পড়লে মানুষ শিখতে চায় না এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানায় না।

আর একটি বিষয় উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। দেশের স্বার্থে, জাতীয় অখণ্ডতা এবং বহিঃশত্রু থেকে দেশ সুরক্ষিত রাখা এবং দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য করণীয়। জাতীয়তাবাদী দায়িত্বশীল সংবাদপত্র কখনোই কর্তব্যরত নিরাপত্তাবাহিনীর অনভিপ্রেত ছোট-খাটো বিচ্যুতিকে অতিরিক্ত প্রচারের আলোয় এনে দেশদ্রোহীদের এবং বিদেশি সমালোচকদের উৎসাহিত করবে না এটাই সঙ্গত। অন্যথায় নেগেটিভ প্রচার নিরাপত্তাবাহিনীর দক্ষতা সঙ্কুচিত করে, তেতে ওঠে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। সাম্প্রতিক জম্মু-কাশ্মীরের ঘটনা প্রবাহ তার সাক্ষ্য বহন করে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সংবাদ মাধ্যমকেই স্ব-আরোপিত সংযম মানতে হবে। বিভাজনোত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা— একটি শক্তিশালী উন্নত জাতি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ নির্ভর করছে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আত্মগরিমার প্রতি দেশবাসীর আস্থার উপর। আর তাতে সংবাদ মাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ এবং সংযত খবর পরিবেশনের দ্বারা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

দুই মহাপুরুষের তুলনামূলক জীবনীগ্রন্থ

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

কম বেশি সাড়ে সাতশো পাতার বিশাল এই গ্রন্থটি হাতে নিয়ে মনে হবে গ্রন্থটি বুঝি স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী। কিন্তু তা নয়— এটি এক মলাটে স্বামীজী ও নেতাজী এই দুই মনীষীর জীবনী। তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে পাতায় পাতায় তুলনামূলক আলোচনা। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে বিরল। স্বামীজী ও নেতাজীকে নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বিরাটায়তনের গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু দুজনকে নিয়ে এমন গ্রন্থ লেখা হয়নি। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অ্যালান বুলকের বিখ্যাত 'হিটলার অ্যান্ড স্টালিন--- প্যারালাল লাইভস' শীর্ষক বিশাল গ্রন্থটির কথা মনে পড়ছে। লেখক বুলক অসাধারণ ধৈর্য সহকারে দুই বিশ্বনেতার জীবন কাহিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি তার সমগোত্রীয়।

লেখক শুরুতে বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন— 'তাঁর যদি সন্তান থাকত তবে কীরকম সন্তান চাইতেন? তাঁর সেই স্বপ্নের সন্তান হতো তিনটি আবশ্যিক গুণে সমৃদ্ধ। যেগুলি হচ্ছে পবিত্রতা, মহানুভবতা আর বীরত্ব।' লেখক দেখিয়েছেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই তিন গুণের বিস্ময়কর সমাহার। নেতাজী সত্যিকারের অর্থে বিবেকানন্দের মানসপুত্র--- কী চেহারায়, কী চরিত্রমহিমায়, কী ব্যক্তিত্বে। যা সচরাচর মনে আসে না লেখক দুই মহাজীবনের কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব উল্লেখ করেছেন। দুজনের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির উপর, দুজনের গঠন অত্যন্ত সুঠাম, বিস্তৃত বক্ষদেশ, কোমল, সুরেলা কণ্ঠ, সুন্দর মুখমণ্ডল, অসাধারণ ধীশক্তি, স্পষ্ট বক্তা, দুজনই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, ভোজন রসিক, বন্ধুবৎসল, হাসিখুশি, দুজনেই শৈশব থেকে ঈশ্বর অনুরাগী এবং অন্তরে সন্ন্যাসী, দুজনেই দার্শনিক এবং দর্শনের ছাত্র। আবার দুজনে বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, দুজনেই অসময়ে কর্মজীবনে থেকে বিদায় নিয়েছেন— একজন ৪০ না পেরোতেই, অন্যজন ৫০-এর আগে। দুজনই জীবৎকালে অসম্ভব খ্যাতি অর্জন করেছেন, দুজনই জাতিকে দিয়েছেন শক্তি আর দিশা।

স্বামীজী এবং নেতাজীর জীবনীকারেরা যা সচরাচর করেন না লেখক শ্রী ভট্টাচার্য তাই করেছেন। তাঁরা এই দুই মহাপুরুষের

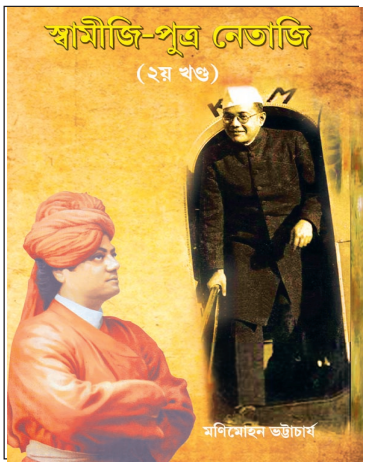

কর্ম জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের পূর্বপুরুষদের জীবনী একটু আধটু ছুঁয়েছেন মাত্র, তাঁদের পিতৃকুল মাতৃকুল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি। লেখক সেই কাজটি অসম্ভব অধ্যবসায় নিয়ে করেছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যে জায়গায় থাকতেন তার বিশদ পরিচয়। মোট কথা, লেখক একজন প্রথম শ্রেণীর জীবনীকার। জীবনী রচনা একটা শিল্প। খুব কম জীবনীকারই জীবনী রচনার রহস্য আয়ত্ত করেছেন। এই লেখক তার মধ্যে একজন।

লক্ষণীয়, দুজনের কর্মজীবন স্বল্প। একজনের দশ বছরের কিছু বেশি। অন্য জনের ২২/২৩ বছরের বেশি নয় এবং দুজনের কর্মক্ষেত্রই ভারত ও ভারতের বাইরে। ভারতের বাইরে থেকে এঁরা জীবনের মহত্তম কাজ করেছেন ও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশাল এদের কর্মের পরিধি। লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা উল্লেখ করে এটিকে একটি আদর্শ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থের রূপ দিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে লেখক সব দিক দিয়ে অসম্ভব কাজ করেছেন। সব শেষে যেটি উল্লেখ করতে চাই তা হলো প্রতি পর্বে দুই মহাপুরুষের তুলনামূলক আলোচনা, যে অসাধ্য কাজটি— পূর্বেই বলেছি— অ্যালান বুলক করেছেন। এটি খুব কঠিন কাজ। হাতের কাছে মালমশালা পেলে তর তর করে ঝড়ের বেগে কোনো জীবনী লেখা যায়। কিন্তু দুটি মানুষের জীবনের প্রতি পর্বে কোথায় কী ধরনের মিল (বা অমিল) তা বিশ্লেষণ করা যারপরনাই কঠিন। লেখক মণিমোহন ভট্টাচার্য সেই দুরূহতম কাজ অনায়াসে সফল হয়েছেন। মোট কথা, স্বামীজী পুত্র নেতাজী (দুই খণ্ড) বাংলা জীবনী সাহিত্যের রত্ন স্বরূপ এবং তুলনামূলক জীবনী রচনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক।

জীবনী রচনার অসাধারণ গুণের সঙ্গে মাণিকজোড়ের মতো মিলিত হয়েছে লেখকের রচনার প্রসাদগুণ। লেখা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি গতিশীল। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্য কবিদের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি গ্রন্থটিকে ক্লাসিক মর্যাদা দিয়েছে। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ সুন্দর। আমরা গ্রন্থটির আশু প্রচার কামনা করি।

স্বামীজি পুত্র নেতাজি (দুই খণ্ড)।
লেখক : মণিমোহন ভট্টাচার্য।
প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স। মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩৫০ টাকা। প্রকাশকাল : ১৪২৩-২৪।

আর একজনকেও নির্ভয়া হতে দেব না, দীপেশের প্রতিজ্ঞা

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২। মুম্বইয়ের দীপেশ টাঙ্ক দিনটা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। এদিন দিল্লির একটি বাসে মানবিকতা লাঞ্ছিত হয়েছিল। মানবিকতার মুখ ছিলেন জ্যোতি সিংহ— সারা বিশ্ব তাকে চিনেছে নির্ভয়া নামে। মানবিকতার পরাজয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ভারত। গর্জে উঠেছিল সমস্বরে। দোষীরা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত গর্জন থামেনি।

নির্ভয়া কাণ্ডের পর দীপেশ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর চৌহদ্দির মধ্যে আর কোনও মেয়েকে তিনি নির্ভয়া হতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞা থেকেই ২০১৩ সালে জন্ম হয়েছিল 'ওয়ার এগেইনস্ট রেলওয়ে রাউডিজ' ক্যাম্পেনের। এর উদ্দেশ্য, রেলপুলিশের সাহায্যে মুম্বই এবং আশপাশের রেলস্টেশনে যারা নারীনিগ্রহ করেন তাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলা। কিন্তু এত বড়ো ভাবনা যার মস্তিষ্ক প্রসূত তিনি এই ক্যাম্পেনের মূল্যায়ন কীভাবে করেন? দীপেশ বলেন, 'আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ!' এরকম একটা মন্তব্য শুনলে অবাক না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু দীপেশের যুক্তি অন্যরকম। তিনি বলেন, 'আমি সুপারহিরো নই। আমিও মানুষ।

আমারও মাঝেমাঝে ক্লান্ত লাগে। আমি চাই সাধারণ মানুষ আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসুন। আমি এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাকে কোথাও যেতে হবে না। মানুষই আমার কাজ করে দেবে। সত্যি যদি এরকম দিন কখনও আসে সেদিন মনে করব আমি সফল।'

মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষা দীপেশ পেয়েছেন তার মা রেখা টাঙ্কের কাছ থেকে। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রেখা কেটারিং-এর ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ছেলেবেলায় দীপেশ দেখেছেন, রাত একটু বেশি হয়ে গেলে রেখা তার মহিলা কর্মীদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। এই ঘটনা দীপেশের মনে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে পুরুষ যতটা সম্মানের অধিকারী, মেয়েরাও ঠিক ততটাই।

অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। দীপেশ কলেজের পড়া শেষ করতে পারেননি। যদিও শেখা ছাড়েননি কোনওদিনও। মাকে সাহায্য করার জন্যই একটি কম্পিউটার উৎপাদক সংস্থায় চাকরি নিলেন। সেখানে কম্পিউটারের হার্ডওয়ার সংক্রান্ত হাজারো খুঁটিনাটি শিখলেন। আস্তে আস্তে সব ঋণ শোধ হলো এবং মাকে নিয়ে ভিলে পার্লের খোলি ছেড়ে উঠে এলেন মালাডের এক কামরার ফ্ল্যাটে।

১১ জুলাই ২০০৬ দীপেশের জীবনে নতুন বাঁক এল। এদিন মুম্বই শহরতলির এক স্টেশনে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ হয়। রেখা ছেলেকে আহতদের সেবার জন্য পাঠান। বিস্ফোরণে এত মানুষ আহত হয়েছিলেন যে রেলের কর্মীদের পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। দীপেশ ও তার ভাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে আহতদের বের করে আনতে সারারাত কেটে গিয়েছিল। বহুবার রক্ত দিতে হয়। সকালবেলায় দীপেশের নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকুও ছিল না।

এই সময়েই এনজিও-র ভাবনা মাথায় এসেছিল দীপেশের। শুরু হয় ইয়ুথ ফর পিপল-এর জয়যাত্রা। ২০১২ পর্যন্ত দীপেশের কর্মকাণ্ড রক্তদান শিবির আয়োজন এবং পথশিশুদের লেখাপড়া শেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপরই ঘটল নির্ভয়া কাণ্ড। দীপেশের কথায়, 'সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল। নানা জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হচ্ছিল। ওই সময় পুরুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমার লজ্জা করত। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সারা দেশে হয়তো পারব না কিন্তু আমার চারপাশে আমি আর একজনকেও নির্ভয়া হতে দেব না।'

মুম্বই শহরতলির স্টেশনগুলিতে মেয়ের নিগ্রহ করা অতি সাধারণ ব্যাপার। প্রথম দিকে রেলপুলিশ কোনও সাহায্য করেনি। দীপেশ বলেন, 'সেটা ওদের দোষ নয়। ওদের অনেক বড়ো বড়ো অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। আমরা যারা এইসব ছোটখাটো অপরাধ ঘটছে দেখেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাই তারা যদি সচেতন না হই তা হলে শুধু পুলিশকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

এখন দীপেশ মুম্বই এবং তাঁর আশেপাশের অসংখ্য মহিলার আপনজন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবকেরা স্টেশনগুলিতে উপস্থিত থাকেন। অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটলেই তাদের সাহায্য পাওয়া যায়! মুম্বইয়ের মেয়েরা জানেন আর কেউ থাকুন বা না থাকুন তাদের বিপদে দীপেশ ভাইয়া অবশ্যই থাকবেন। ■

শোকসংবাদ

মালদা জেলার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের প্রথম আচার্যা এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা অপর্ণা পোদ্দার (ভক্ত) গত ১৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ নিবাসী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর দাদা স্বর্গীয় ধূর্জটিপ্রসাদ পোদ্দার সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক ছিলেন। তাঁর আর এক ভাই হিরিণপ্রসাদ পোদ্দার সঙ্ঘের দ্বিতীয়বর্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক। তাঁর অকালমৃত্যুতে চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির পক্ষে ২৩ অক্টোবর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

* * *

মালদা জেলার চাঁচলের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী রতন কুমার রাম (বাবলু রাম) গত ২০ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ এবং ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক শচীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০ অক্টোবর

পরলোকগমন করেন। তিনি রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

খড়্গপুর শহরের স্বয়ংসেবক রাজকুমার ঝা-র মাতৃদেবী শুভকলা ঝা গত ৯ অক্টোবর বিহারের দ্বারভাঙ্গার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্বামী, ২ পুত্র, ২ কন্যা, ২ পুত্রবধূ, ২ জামাতা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। স্বামী সূর্যদেব ঝা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলার কার্যকর্তা ছিলেন।

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ রায় স্মরণে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সহকর্মী (এশিয়াটিক সোসাইটির) অসীমকৃষ্ণ রায়ের দাদা প্রয়াত গোপালকৃষ্ণ রায় ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজসেবক। অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন, ধুতি-পাঞ্জাবি ছিল তাঁর পোশাক। থাকতেন পিকনিক গার্ডেনের সরকারি আবাসনে। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু মানুষের উপকার করেছেন। বহু বেকারকে চাকরি দিয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির নবরূপকার প্রয়াত ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরীর সময়ে (সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) প্রয়াত সাংবাদিককে খুব দেখা যেতো। তিনি যখন শিলংয়ে ছিলেন সোসাইটির একটি অনুষ্ঠান করান প্রয়াত ডাঃ রায়চৌধুরীর অনুরোধে। আমার প্রথম ছড়ার বই (বাছাই ছড়া) তাঁর হাতেই উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, স্বস্তিকার 'নবাঙ্কুর' বিভাগে ছড়া লিখছেন না কেন? লেখা পাঠাও আমি সম্পাদককে লেখা ছাপতে বলে দেবো। তাঁর কাছে কোনো অনুরোধ করলে, 'না' ছিল না। সে অনুরোধ তিনি রাখতেন'ই। পুজো এলে তাঁর কথা মনে পড়ে। অনেক শারদীয়া সংখ্যায় লিখতেন। লেখা পড়তাম। প্রয়াত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ ছিল। তাঁকে নিয়ে লেখা বই খুব খ্যাতি অর্জন করেছে।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

ভৌতিক

রাতের লাইব্রেরি

ইতিহাসের গবেষক বছর চল্লিশের সুপ্রভ মজুমদার। গবেষণার কাজে অনেক পড়াশুনা করতে হয়। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে নোট নিতে দেখা যায়। একবার উনি ইংরেজ

আমলের এক অফিসারের নাম পড়লেন কোনও এক পত্রিকায়। ওই অফিসার নাকি এই ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বরেই মারা গেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অফিসার প্রতিদিন প্রায় রাত অবধি পড়াশুনা করতেন। মৃত্যুর আগের দিনও তাকে লাইব্রেরিতে দেখা গেছে।

সুপ্রভবাবু ঘটনাটি পড়ার পর আগ্রহী হয়ে উঠলেন বিষয়টি নিয়ে। কে ওই অফিসার, কী করে হলো তাঁর মৃত্যু? লাইব্রেরিতে ঘাটঘাটি শুরু করলেন। ওই সময়ের বিভিন্ন ক্রিমিনাল রেকর্ড, কলকাতার ইতিহাস, বড়বড় লেখকদের অভিজ্ঞতার বই পড়তে লাগলেন।

একদিন খুব মন দিয়ে তিনি একটি বই পড়ছিলেন। বইটি ছিল কলকাতার ভৌতিক বিষয়ের ওপর। পড়তে পড়তে বইটির মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন। বইটিতে অনেক বড়বড় ভুতুড়ে বাড়ির নাম আছে। এমনকী এই ন্যাশনাল লাইব্রেরির নামও। সুপ্রভবাবু আরও আগ্রহ নিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তন্দ্রা এসে যাওয়ায় টেবিলে মাথা রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন অনেক রাত। লাইব্রেরি ফাঁকা। একজন লোকও নেই। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখলেন বাইরে আলো জ্বলছে। উনি তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু দরজা তো বন্ধ, বাইরে বেরোবেন কী করে? বাইরে নিশ্চয়ই গার্ড আছে। সুপ্রভবাবু চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু কারও কোনও সারা নেই। অন্ধকার লাইব্রেরিতে বড়বড় বইয়ের তাক, কোথাও কেউ নেই। এবার একটু একটু ভয় করতে লাগলো সুপ্রভবাবুর। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

এমন সময় মনে হলো বইয়ের তাকের আড়াল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে আসছে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি। ইংল্যান্ডের মানুষরা যেমন পরে। লোকটি এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন, দরজাটি খুলে গেল। কিন্তু লোকটির কোথায়? একদিক ওদিক খুঁজে দেখলেন কোথাও পেলেন না।

লাইব্রেরির লম্বা রাস্তা পেরিয়ে সুপ্রভবাবু মেন গেটে এলেন। সেখানে দুজন সিকিউরিটি গার্ড বসে আছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন— তোমরা একজন মানুষকে দেখেছ? লম্বা ওভারকোট, মাথায় টুপি।

গার্ড দুজন একে অপরের দিকে চাইলো, বিড়বিড় করে বললো, —শয়তান আ গয়া! তারপর এক দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

সুপ্রভবাবু দেরি করলেন না। রাস্তায় এলেন। বাড়ি যেতে হবে। কিন্তু রাত অনেক। গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো সামনে। সুপ্রভবাবু ট্যাক্সিতে উঠে বললেন— মানিকতলা চলো।

ট্যাক্সিতে বসে বসে আগের ঘটনাগুলি ভাবছিলেন। এমন সময় খেয়াল করলেন ড্রাইভারের সিটে ড্রাইভার নেই, ট্যাক্সি কিন্তু চলছে।

এরপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন সকাল। নিজের বাড়ির দরজার সামনে তিনি পড়ে আছেন।

ভারতের পথে পথে

সোমনাথ

সোমনাথ ভারতের প্রসিদ্ধ শিব মন্দির। গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে এই জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। এটি চিরন্তনপীঠ নামেও পরিচিত। মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা বহুবার মন্দিরটি লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭০১ সালে ঔরঙ্গজেব মন্দিরটি ধ্বংস করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর ১৮৮৩ সালে রানি অহল্যাবাঈ হোলকরের প্রচেষ্টায় মসজিদের পাশে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার প্যাটেলের উদ্যোগের বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি

সর্বে অপি পলায়নশীলা:।
সকলেই পলায়নবাদী।
অসম্বদ্ধং মা প্রলপতু।
ফালতু কথা বলবে না।
সর্বস্য অপি ভবান্ এব কারণম্।
সবেরই মূল কারণ তুমি।
সরলতয়া তস্য জালে পতিতবান্।
সহজেই তার জালে ফেঁসে গেছে।
অস্মাকং মেলনান্তরং বহু কাল: অতীত:।
আমাদের সাক্ষাতের পর বহুকাল কেটেছে।

ভালো কথা

অচেনা ঠাকুমা

বয়স্কদের জন্য কোনো কোনো মেট্রো স্টেশনে আলাদা কোনও ব্যবস্থা নেই। হয় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, নয় চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে। একদিন রবীন্দ্রসদন স্টেশনে দেখলাম এক বয়স্ক ঠাকুমা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না পেরে এমনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। একটুখানি উঠেই হাঁপিয়ে পড়ছেন, তারপর আবার উঠছেন। আমি সেদিন দিদির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা ওই ঠাকুমাকে জল দিলাম এবং ধরে ধরে একটু একটু করে স্টেশনের বাইরে বের করে নিয়ে এলাম। যাবার সময় উনি আমাদের আদর করে চকোলেট খাওয়ালেন।

নবার্ক পাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ছোটবেলা

অমিতকিরণ রায়, নবম শ্রেণী, কালচিনি

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম
ছিলাম ভালো বেশ,
হাসি খেলা আনন্দেতে
কাটিয়ে দিতাম বেশ।
পড়াশুনা, কাজকর্ম
কিছুই ছিল না,
দুষ্টুমিটা করলে পরে
বকুনি জুটত না।

মায়ের আদর, বাবার আদর
ঠাকুমার আশকারা,
দাদা-দিদির পেছন পেছন
সবার নকল কারা।
বয়স বাড়লো বড় হলাম
হারিয়ে গেল সব,
মাঝে মাঝে ভাবতে বসে
করি শুধু আফশোস।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

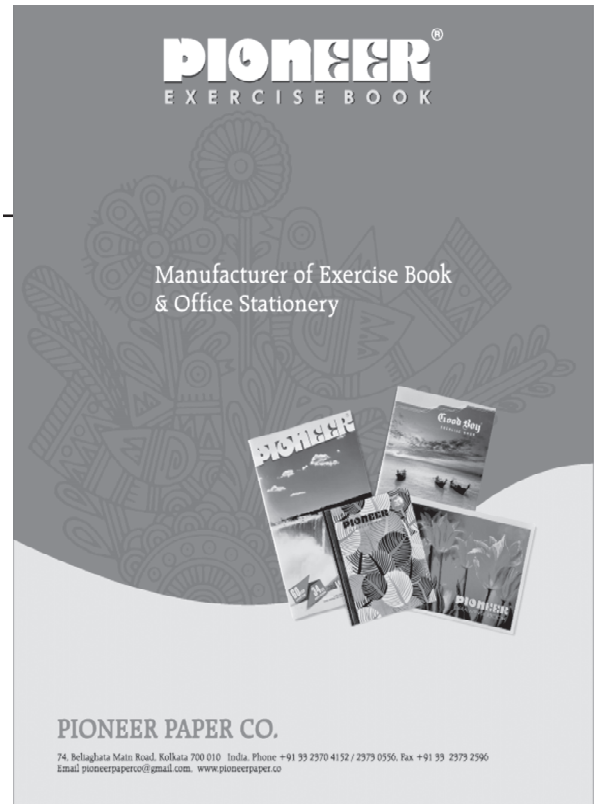

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

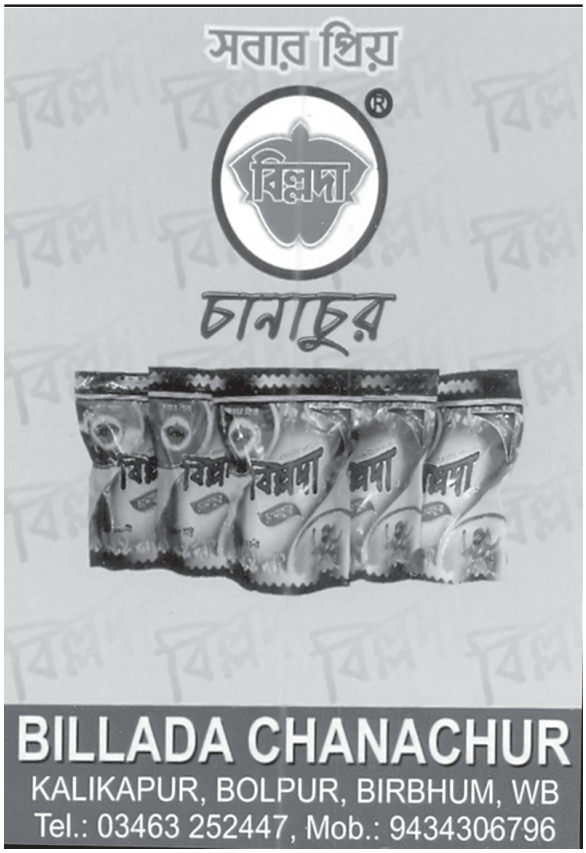

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
13 November - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।